প্রকাশক : রঞ্জনকুমার দাস
রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

প্রথম প্রকাশ :
শ্রীপঞ্চমী ১৩৬৭

মুদ্রাকর :
পশুপতি দে
শনিরঞ্জন প্রেস
কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদ চিত্র :
অন্নদা মুন্সী

শ্রীমতী হিমাংশুবালা দেবী

পরমারাধ্যাসু—

মা গো, কে জানতো আমার সূতিকাগার বোলপুরের রাঙামাটির ঋণ এমনি ভাবে তোমার-বাবার চোখের জল আর আমার পরমপ্রিয় শুভাকাঙ্ক্ষীদের মর্মবেদনার বিনিময়ে পরিশোধ করতে হবে !

আজ থেকে বেশ কয় বছর আগে, সে আর এক শ্রীপঞ্চমী তিথিতে, আমার লেখার খাতার মাথায় তুমি সস্নেহে লিখে দিয়েছিলে —'আমার ইচ্ছে তুমি কবিতা লেখো, তোমার কবিতা আমার ভাল লাগে।' মনে আছে নিশ্চয়ই ! তোমার সেই হস্ত-লিপিটুকু আজও আমার খাতায় সমুজ্জ্বল।

আমার কিন্তু ঝোঁক ছিল বেশি দর্শন, নাটক আর কথা-সাহিত্যের ওপরে।

কিন্তু আশৈশব যাকে রাত্রে প্রণাম না করে শুতে যাই নি কখনও, তার ইচ্ছার মূল্য আমার অন্তরের বিচারশালায় যে কতখানি—তা বলে বোঝাবো কাকে ?

ঠিক করলাম—কবিতাই লিখবো।

কিন্তু বিষয়বস্তুর জন্যে নামবো এক দুরূহ গবেষণায়।

শুরু হ'ল ক্লান্তিহীন বিরতিহীন মুসাফিরি দুরন্ত গতিতে—দুনিয়ার প্রায় সব প্রান্তের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে দিয়ে।

সে খবরও তোমার অজানা নয়।

আজ 'মমির ক্রন্দন'-এর মধ্যে দিয়ে আরম্ভ করলাম আমি প্রথম কথা বলা।

দীর্ঘ বিশ বছর কেবল দেখেছি, শুনেছি আর উপলব্ধি করেছি, বলি নি কিছুই। এবার বলবো। আর বলবো প্রথম তা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করে কাব্যেরই সুরে—আর এক শ্রীপঞ্চমীতেই।

কিন্তু এ-কাব্যে প্রেম, পুষ্প অথবা প্রকৃতির লীলাকীর্তন তো থাকবে না! তুমি ছাড়া আর কি কেউ এমন বিরস বিবর্ণ বস্তু পড়তে চাইবে?

তবু উপায় নেই—বলতে যে আমাকে হবেই, মা!

দীর্ঘ বিশ বছরের সুদীর্ঘ পদযাত্রার শেষে—অনেক অশ্রুতে সিক্ত, অনেক তাচ্ছিল্যে ক্ষতবিক্ষত, ক্লান্তিকুব্জ মনটা আজ তার বক্তব্যের প্রথম প্রকাশ-মুহূর্তে এক দুঃসহ প্রেরণায় থর থর করে কাঁপছে।

তোমার আর বাবার আশীর্বাদ সে-প্রেরণাকে ভাষা দিক, উদ্বুদ্ধ করুক তাকে নির্ভীক, নির্বিকার এবং নির্লিপ্ত স্ফুরণে।

চণ্ডাশোক

'চণ্ডাশোকে'র প্রথম কাব্য-সংকলন "মমির ক্রন্দন" কাব্যরসিকদের হাতে তুলে দিতে পেরে প্রকাশকরূপে যুগপৎ আনন্দ ও গৌরব বোধ করছি। ভাব-গাম্ভীর্য ও ছন্দ-মাধুর্যের অতি-বিরল সমন্বয়ে রচিত ভিন্ন সুরের এই কবিতাগুলি আমাদের ভাল লেগেছে বলেই গ্রন্থাকারে প্রকাশে উদ্যোগী হলাম। আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে দুরন্ত প্রতিযোগিতার নির্মম মনোবৃত্তি নিয়ে সম্প্রতি নানাভাবে যেসব অদ্ভুত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তার ফলে কাব্যলক্ষ্মী অলক্ষ্যে অন্তর্হিতা হয়েছেন। 'চণ্ডাশোকে'র কাব্য-অর্ঘ্য দেবীকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হবে বলে আশা করি।

প্রকাশক

৬০নং পৃষ্ঠার প্রথম পংক্তির শেষে দাঁড়িচিহ্ন বাদ দিয়া পড়িতে হইবে।

অক্ষম

লিখ্‌তে বসি নি চিত্তবিলাসী কাব্য।
কল্পনা রং-এ এঁকে আল্‌পনা
মিঠে কথা দিয়ে মায়াজাল বোনা—
বন্ধু, সেটি তো আমি পারবো না,
বরঞ্চ বসে ভাববো—
বাস্তবে যেটি হবে কি না হবে,
সত্য শুনে কে নীরবে তা সবে,
কোন্ কথাটিকে কেমনে কে লবে,
ফাঁকি দিয়ে কারা ফাঁকেতেই রবে—
সেই সব সম্ভাব্য—
লিখে যাবো আমি আকাট গদ্যে,
ছলকলা নেই আমার মধ্যে,
সত্যেরই মাঝে সত্যটুকুকে মাপ্‌বো।
সত্য অমর, তার ছোঁয়া পেলে
অমরতা পাবে কাব্য।

তাই—

তুতেন খামেনের মমিকে কি কেউ কাঁদতে দেখেছে ?
না।
মমির প্রাণ নেই, সে কাঁদতে পারে না ; তাই কাঁদে না।
তবে আমি মমি হয়েও কাঁদি কেমন করে ?
বিজ্ঞান সজ্ঞানে একথা কখনই বিশ্বাস করবে না।
তবু কান্না তো থামে না।

যে-কান্নাতে চুনী-পান্না ঝরে না, এ যে সেই কান্না।
যে-কান্না প্রাণ-না-থাকা চোখেও অশ্রুর বান-না-ডাকিয়ে ছাড়ে না,
এ যে সেই কান্না।
শত অবিশ্বাসের ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাসের মধ্যেও এ কান্না মিথ্যা নয়।
অন্যের সমবেদনা আকর্ষণের জন্যে যে কান্না
এ কান্না ঠিক তা নয়।

আমার অতীত—
মিশরী 'ফারো'র চেয়ে আরও আনন্দোজ্জ্বল হয়তো নয়,
তবু আনন্দের অভাবের অভাব সেখানে বড় কম ছিল না।
আমার বর্তমান—
ক্রমবর্ধমান অবহেলা আর অবজ্ঞার
বেলয় বেসুরা এক বিভ্রান্ত মূর্ছনা।
তাই কি মমি হয়েও, মৃত হৃতদৃষ্টি দুই চোখে জল ছল্ ছল্ ?

আমি তো রসায়নের রসে রক্ষিত কোনো মমি নই।
আমি যে জীবন্মৃত, আত্মপ্রবঞ্চনায় আত্মহত,

নিজ হস্তে উৎপাটিত নিজ জীবন-শিকড়ের ভীষণ যাতনায় কাতর,
ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানহীন,
নিজ প্রমাদ-প্রয়াগে নিমজ্জিত
এক অবিশ্বাস্য মমি।

তুতেন খামেনের দেহের মৃত্যু হয়েছিল—
তাই তার মমি কাঁদে নি।
আর, দেহ নয়, আমার আত্মার মৃত্যু আমিই ঘটিয়েছি ;
মমি হয়েও আমার কান্না তাই আজও থামে নি।

* * * * *

পুনশ্চ— বেদান্তের সিদ্ধান্ত কি এ বৃত্তান্তে চমকে উঠল ?
আত্মা যে মৃত্যুহীন।

মিথ্যা নয়।
আত্মা স্বেচ্ছায় হয়তো কখনই মরে না।
কিন্তু আত্মার আধার যখন আত্মার পবিত্রতায়
বাধার সৃষ্টি করে,
তখন বিবেকবর্জিত পাতকমজ্জিত সেই আধারের
দুষ্কৃতির খড়্গাঘাত থেকে আত্মারও নিষ্কৃতি নেই।

আর সেই আঘাতেই আত্মাও তার শুদ্ধতার
অমরত্ব হারায়।
মানুষের হীনতায়, মানুষের হৃদয়ের দীনতায়—
যা অবিনশ্বর, তাও অনিবার্য অসহায়তায়
নশ্বরের রূপ পায়

মনে হয়

ওয়েস্ট এণ্ড-এর বিশিষ্ট পাব-এর অশিষ্ট মজলিস।
তর্কের আইস্‌বার্গ ভাসছে রাজনীতির নীতিহীন স্রোতে।

প্রশ্ন নয়তো, যেন ভদ্‌কা, শ্যাম্পেন্‌ আর
তাড়ির বিক্ষুব্ধ সঙ্গম।
কাকে বলা যায় বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী?

হাভানা ঠোঁটেতে গুঁজে বললে একজন—
'শ্রেষ্ঠ নয়, একমাত্র সাম্যবাদী ছিলেন লিংকন।'
আর তখনই মার্বেল-টপ টেবিলে পড়েছে শ্বেত ভালুকের থাবা।
ভীষণ শব্দে টেবিল চাপড়ে গর্জে উঠে
আর একজন তুলে ধরেছে তর্কের সঙ্গীন—
'ড্যাম্‌ লিংকন, ড্যাম্‌ আর সব নাম।
শুধু একটি নামেই আছে সাম্যবাদের কাম্য স্বাদ—
সে নাম লেনিন।'
ব্যস, অমনি তর্ক জমে আইস্‌বার্গ
রাজনীতির নীতিহীন স্রোতে।
কেউ বলে গান্ধীর নাম, কেউ বা মাও-এর,
একে একে ওঠে নাম যীশু, বুদ্ধ, মহম্মদের।

আর ঠিক সেই সময়ে—
হুড়মুড় করে পাব-এতে ঢুকেছে পাগলাটা।
সেই যাকে ট্রাফল্‌গার স্কোয়ারে

ছেঁড়া প্যাণ্ট আর তালিমারা কোটে
বুঁদ্ হয়ে বসে থাকতে দেখেছে অনেকেই—
এ পাগলা সেই।

ঢুকে, এক লহমার জন্যে শুনল
তর্কের বিষয়বিসম্বাদ,
তারপরেই হো হো করে হেসে
বললে, 'বেশ, সবার বক্তব্যের শেষে
আমি বলবো একটি নাম।'

'এখনই বলো না' দাঁতমুখ ভেংচে বললে
মার্বেল-টপ টেবিলের ওপর ভীষণ থাবাদার।
'সবার সব নাম বলা শেষ হয়েছে, এবার বোধহয়
পাগল নিজেই নিজের নাম বলবে শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী হিসেবে—'
হাসতে হাসতে কাশতে কাশতে
বললে লিংকন-ভক্ত।

'না গো, না' পাগলা যেন চাগলা—
দাঁড়িয়েছে ইউ. এন. কাউন্সিলে
এমনি মুখের ভাব।
বললে, 'দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদীর নাম—'
একটু থামলো পাগলা।
পাব-জমায়েৎ উৎকর্ণ।
যেন দুয়ারে হাজির উত্তমর্ণ
কোনো নীতির সঙ্গেই প্রীতি নেই যার,
তাই সশঙ্ক এই আগ্রহ সবার।

'মৃত্যু'—পাগলা চীৎকার করে ওঠে,
'দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী যে
মৃত্যু তারই নাম।
তার কাছে ধনীদীন সবাই সমান।'

মনে হয়—
পাগলার কণ্ঠ যেন নয়,
এ যেন বেদ-আবেস্তা-কোরান্-বাইবেল-
ত্রিপিটকের মর্মর ক্রন্দন।
অজস্র ডায়লেক্ট্ আর সারমনের ভগ্ন পিরামিডের নীচে
ছোট্ট তবু অতি সহজ
সত্যের স্পন্দন।

বোকার হাসি

ওরা বলে—
বোকা তিনবার হাসে।
আমি বোকার শিরোমণি, অজ্ঞ বোকা, আস্ত বুদ্ধুদেব,
তাই আমি হেসেছি তিনবারের পরেও
আরও একবার বেশি।

প্রথম হেসেছি গ্যালিলিওর সাজে
ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে।
আমি বোকার মত সত্য বলেছিলাম—
সূর্য পৃথিবীর চার পাশে ঘোরে না
পৃথিবীই ঘুরছে সূর্যকে কেন্দ্র করে।
এই মূর্খ সত্যভাষণ পেলো শক্ত শাসন
এলো ভীষণ সাজা—
নাস্তিকতা, ধর্মদ্রোহীতা, আর সাধারণের বিশ্বাসে
আঘাত হানার অপরাধে
আমার মৃত্যুদণ্ড।
সেই মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই বোকা প্রথম হেসেছিল
অবশ্য শেষ পর্যন্ত দণ্ড থেকে রেহাই পেয়েছিল এই অপোগণ্ড।
তখন বোধ করি বুদ্ধিমান মানুষের ইতিহাস হেসেছিল।

দ্বিতীয় বারের হাসি এসেছিল—
চরম বুদ্ধিমান পরম মিত্র জুডাসের সামনে ক্রুসে ঝুলে।

ট্রিনিটির তিন প্রতিনিধি যেন তিনটি পেরেক।
সেই পেরেকে গাঁথা আমার আদর্শরঞ্জিত হাত আর পা।
আমার দুই ধারে দুই চোর ঝুলছে আলাদা দুটি ক্রসে।
তারা প্রশ্ন করেছিল—
আমরা না হয় চৌর্যের ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধী
তাই ভোগ করছি, এই ভয়ানক সাজা,
কিন্তু তুমি ? তোমাকে দেখে তো আমাদের
একই গোত্রের বলে মনে হয় না।

হাসি এসেছিল এ-প্রশ্নেরই উত্তরে।
আমি বোকা, তাই মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যেও না হেসে পারি নি।
আমাকে আমিই ক্রসে ঝুলিয়ে হত্যা ক'রে
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে
আমিই আবার পুজো করে চলেছি আমাকে—
এক নিরেট বোকার কাছে
এ কি কম বড় হাসির কথা ?

বিরাট এই বোকা-নাট্যের তৃতীয় দৃশ্যে যে-বোকা হাসলো
দিল্লীর বিড়লা ভবনের প্রাঙ্গনে
তিরিশে জানুয়ারীর শৈত্যশীর্ণ সন্ধ্যায়—
সেই বোকাও আর কেউই নয়,
এই আমিই।
নাথুরাম যে বোকার চেয়েও বোকা
তাই দেখেই এই হাসি।
বোকার আদর্শকে হত্যা করতে চায়
গানপাউডারের বাণ দিয়ে যে নির্বোধ

সে যে আমার বোকামিকেও হাস্য মানায়—
হাসি তাই বোধ মানে নি সেদিন।
মাটিতে যে রক্ত ঝরেছিল বলে পত্রপত্রিকায় ঘোষিত হয়েছিল,
আসলে তা রক্ত নয়,
বোকারই হাসির ঝলক।
বিদেহী আদর্শবাদকে দেহী ভেবে গুলি ছোঁড়ে
যে দুর্ভাগা মুর্খ—
এই বোকার লাল হাসির ঝলকে ঝলকে
তারই জন্যে অনুকম্পা
ধরিত্রীর মাটির সঙ্গে মিশে রইল।

চতুর্থ এবং শেষবারের হাসি হেসেছিলাম আদালতে
না টক না মিষ্টি এই নাটকের শেষ দৃশ্যে।

যবনিকা উঠতেই কিন্তু সবাই বিস্ময়ে স্তম্ভিত।
আমার আবির্ভাব এ-দৃশ্যে প্রতারকের ভূমিকায়।
কোর্টের বিচারকক্ষে বিচারপতি উচ্চাসনে সমাসীন,
আমি দণ্ডায়মান প্রহরীপরিবেষ্টিত আসামীর কাঠগড়ায়।
সাক্ষী—স্বয়ং ফরিয়াদী
লোকারণ্যে সত্যপ্রেমী, জনপ্রিয়, পরমার্থবানের সম্মান যার ভূষণ।

কিন্তু সত্যিই আমি অপরাধী।
লাভের লোভ দেখিয়ে তিনশোটি টাকা নিয়েছিলাম
ফরিয়াদীর কুবের ভাণ্ডার থেকে।
বেচারীর লাভ তো হয়ই নি—
লোভের বশে আমার হাতে টাকাগুলি গুণে দিয়ে
সেগুলোও বেমালুম বেপাত্তা।

লোভ না মিটলেই ক্ষোভ।
আর সেই ক্ষোভ মিটাতেই এত কাণ্ড—।
কোর্টে নালিশ, উকিলের জুতায় টাকার পালিশ,
সাজানো সাক্ষীদের শ্রীপদে মালিশ।

মাম্‌লার হাম্‌লার শুরুতেই
বিচারক শুধালেন—
'সত্যিই তুমি কি এঁর কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলে?'
বোকার শিরোমণি উত্তর দিলাম—'সত্যি হুজুর, নিয়েছিলাম।'
ফরিয়াদী 'কেল্লা ফতে'র কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল—
'তবে তো হয়েই গেল হুজুর, এবার সাজা দিন।'
বিচারক পুনশ্চ শুধালেন—'কত টাকা তুমি নিয়েছিলে?'
সত্যি কথাই স্বীকার করলাম।
বললাম—'তিন শো টাকা হুজুর।'
'সে কি?' বিচারকের ভ্রূ বেশ কয়েকবার উঠল নামল,
শেষে থামল।
তিনি বললেন—'কিন্তু ফরিয়াদী বলছেন তুমি নিয়েছ তিন হাজার,
আর তাও নিয়েছ মিথ্যে কথায় ঠকিয়ে!'

তিন হাজার!!
বলেছে বুঝি ফরিয়াদী?
মিথ্যে কথায় ঠকিয়ে নিয়েছি আমি
আর ও বুঝি এখন সত্যি বলছে?
হাঃ হাঃ হাঃ—

আর একটু হলেই হাসতে শুরু করেছিল এই বোকার সেরা বোকা,
মুখে হাত চেপে থামালাম সেই হাসি।

ফরিয়াদীর সাইরেন শোনা গেল—
'ধর্ম কসম হুজুর, ও তিন হাজার নিয়েছিল।
বেটা মিথ্যুক, ঠগ্, জোচ্চোর।'

পেছন থেকে জনৈক উকিল ফিস্‌ফিস্ করলেন—
'স্বীকার করতে গেলি কেন গাধা?
তুই টাকা নিয়েছিস তার কোনও প্রমাণ আছে ওর কাছে?'
উকিল হয়তো আমার মঙ্গলই চেয়েছিলেন,
কিন্তু তিনি তো জানতেন না—এ প্রতারক কত বড় বোকা,
আর বোকারা যা করে তার সবই যে বলে দেয় সবাইকে,
নইলে তাদের বোকা নাম হবে কেন?

এরপর—
আটজন সাক্ষী এলেন পর পর।
সবাই বললেন—নিজের চোখে দেখেছেন আমায় গুণে গু
তিন হাজার টাকা নিতে ফরিয়াদীর হাত থেকে।
তাঁদের মধ্যে নারীসাক্ষী ছিলেন তিনজন।
অথচ, জানেন নারায়ণ,
আমি যখন টাকা নিয়েছিলাম ফরিয়াদীর বাড়িতে বসে
ত্রিসীমানায় ছিল না তৃতীয়জন।

পুলিস প্রসিকিউশন
নামমাত্র আরগুমেন্টের সিমেন্ট চড়াবার পরেই—
বিত্তবান ফরিয়াদী সিক্তপ্রাণ পেশকারের কানে কানে
কী যেন বললেন।
পেশকার উঠে গিয়ে হয়তো হুবহু সেই কথাই পেশ করলেন
চিত্তবান ধর্মাবতারের কাছে।

বিচারক একটু হাসলেন, মনে হল।
আর তার পরেই শোনালেন জাজমেণ্ট—
'নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে
আসামী প্রতারণা করে নিয়েছে তিন হাজার, তিন শো নয়।'

তখনও উদ্‌গত হাসিকে অতি কষ্টে সম্বরণ করে
এই বোকা চুপ করেই ছিল,
কিন্তু ঐ হাসি কিছুতেই আর বাধ মানলো না তখন
যখন হুকুম হাঁক্‌লেন হুজুর—
'তিন হাজার টাকার প্রতারণার অপরাধে
আসামীকে কারাদণ্ড দেওয়া হ'ল ছ'মাসের।'

উঃ, বোকার তখন সে কী থল্‌থলিয়ে হাসি
সেদিন গড়াগড়ি করে।
হাসির দাপে বিচারক কাঁপে, ফরিয়াদী কাঁপে,
সাক্ষীরা কাঁপে,
আর কাঁপে—
বিচারকের মাথার ওপরে দেওয়ালে ঝোলানো
'সত্যমেব জয়তে।'
এমন প্রচণ্ড আর প্রবল হাসি বোকা আর হাসে নি
আদালতে বোকা সত্য বলেছিল—
তাই বুঝি তার জয় হয়েছে?
আর ফরিয়াদী ....
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

শেষ দৃশ্যের যবনিকা যখন নামলো
বোকার অট্টহাসির হট্টরোলের মধ্যে—

দর্শকদের চোখ গিয়ে তখন পড়েছে
বোকার চোখে।
দর্শকরা তো অবাক।
বোকার পোড়া চোখেও জল আসে তাহলে ?

এইবার হয়তো প্রশ্ন উঠবে—
এই যে এতক্ষণ 'আমি—আমি' করে মরলাম বক্তব্যের গোলকধাঁধায়,
কে এই আমি ?

উত্তরে আমিই বলবো—
আমি আদম্-ঈভের জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার আদিম ভুলে
তৈরী মানবসত্তা।
যুগে যুগে আমি সত্য বলে বোকামি করেছি,
যুগে যুগে আমিই ভুল করে আমাকে সাজা দিয়েছি,
নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করতে যুগে যুগে হেয়তর কাজ করে
এই চিরবোকা আমিই সেজেছি ফরিয়াদী আর আসামী—
মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি আদালতে,
আবার ভুল করে আমিই হেসেছি বারবার।

বোকারা যে তিনবার হাসে—
ওরা তো আর মিথ্যা বলে না।
কিন্তু, বোকার শিরোমণি হাসে চারবার
ওরা বোধহয় এ কথা জানে না।

কবে

কোনো এক দেশের মস্ত মন্ত্রীর শুভাগমন সম্ভাবনায়
পল্লীগ্রামে উৎসাহের জোয়ার এসেছে।
পরম পূজনীয় মন্ত্রীমশাই আসবেন শাসনযন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে
কুটীর-শিল্প-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করতে।
পল্লীপ্রবেশপথ তোরণে সুসজ্জিত।
প্রদর্শনীর প্রবেশপথে রক্তগোলাপের মালা হাতে স্বয়ং গ্রামের মোড়ল।

যথা সময়ে গাঁয়ের পথে ধুলো উড়িয়ে
শহরের মানুষ সেই মন্ত্রী এসে হাজির হলেন মটোরে চড়ে
নাকে রুমাল চাপা দিয়ে।
ধুলোয় নাকি থাকে যক্ষ্মার জার্ম,—
মন্ত্রীর ফুস্‌ফুসে যদি করে হার্ম,
বলা যায়?
অতএব, রুমালের প্রহরায় থাক্‌ মন্ত্রীর নাসারন্ধ্র বন্দী।
আহা! চাষীই যে দেশের প্রধান অধিবাসী
সে-দেশের মন্ত্রী যিনি—
ধুলো কি তাঁর নাকে সহ্য হয়?

চামড়ার কাজ দেখে মন্ত্রীমশাই তো বিস্ময়ে হতবাক্‌।
পার্শ্বচর মোড়লকে শুধোলেন—'এই লেদারক্রাফট্
কি এই গাঁয়েরই কারুর কীর্তি?'
বিগলিত মোড়ল বিচলিত হলেন।

হতভাগা চামারটা একবার মন্ত্রীর দিকে চেয়েও দেখ্‌ছে না,
বিড়ি ফুঁকে চলেছে নির্ভাবনায়। কী জ্বালা।
এখন মোড়ল কেমন ভাবে পরিচয় করায় ঐ অভদ্র বেয়াদবটাকে,

মন্ত্রী পুনশ্চ বললেন—'এ শিল্পী নিশ্চয়ই
ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় বিশেষ ট্রেনিং পেয়ে
এমন নিখুঁত কর্মী হতে পেরেছে।
এমন ক্র্যাফ্‌টম্যানশিপ অবশ্য আমি জাপানেও
দেখেছি অনেক জায়গায়।
আমি দেখতে চাই একবার সেই অতুল শিল্পীকে।'

দ্বারোদ্ঘাটকের কথায় মোড়লের মগজে
দন্তোৎপাটনের যন্ত্রণা।
বলেন কি মাননীয় মন্ত্রী ?
মুখপোড়া চামারটা যে আজ অবধি
এ-গাঁয়ের বাইরেও পা বাড়ায় নি।
ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান—
এ সবের নামই কি ও শুনেছে ওর বাপের জন্মে ?
এখন তারই সঙ্গে পরিচয় করায় মোড়ল কেমন করে ?

মন্ত্রী তাড়া দিলেন।
কই হে ? শিল্পী কোথায় ?
তাঁর ঐ অপূর্ব চামড়ার কুশনটা আমি কিনলাম
আড়াই শো টাকায়।
কিন্তু তিনি কোথায় ?

এই মরেছে।
'তিনি' 'তাঁর'। মন্ত্রীর সম্মানসূচক সর্বনাম ব্যবহারের মধ্যে

মোড়লের সর্বনাশের ডঙ্কা বাজছে যেন,
বেচারী আতঙ্কে মরে আর কি।
'তিনি' যে ওদিকে হাঁটুর ওপর ধূলিধূসর কাপড় তুলে
বিড়ি ফুঁকে চলেছেন অবিরাম বেপরোয়া ভাবে।
কিন্তু নিরুপায়।
মন্ত্রীর তাড়ায় শেষ পর্যন্ত দিতেই হল হতভাগার পরিচয়।
'এই নটোবর!' হাঁক্‌লো মোড়ল।
চামার চম্‌কে উঠে চাইল তার দিকে।
তার আধখাওয়া বিড়িটা মাটিতে ঠেসে নিভিয়ে,
পরে সেটাকে কানে গুঁজে জবাব দিল সে—'এজ্ঞে'।

প্রচণ্ড হুঙ্কারে ধম্‌কে উঠলো মোড়ল—
'এজ্ঞে কিরে হারামজাদা চামার?
দেখছিস না সামনে কে দাঁড়িয়ে, সেলাম কর।'

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো নটোবর এবার অতিথি মন্ত্রীর দিকে,
তারপর মোড়লকে শুধালো—
'ইনি কে বটেন মোড়ল মশাই?'
এবার মোড়লের বদলে পেছন থেকে আল্‌টিমেটাম্‌ দিয়ে বসলেন
জেলাধীশ স্বয়ং—'তুমি সেলাম করবে কিনা আমি জানতে চাই।'
উত্তরে নটোবর কিন্তু নিরুত্তাপ।
অতি সহজ সুরেই সে শুধালে—'কিন্তু কাকে সেলাম দেবো?
কেন সেলাম দেবো?'
'মন্ত্রীমশাইকে সেলাম দিবিরে—ইতর, বর্বর!'
মোড়ল এবার মারমুখী।

অম্লান বদনে নটোবর আবার প্রশ্ন করে বসলো
'মন্ত্রীবাবু কি করে থাকেন মোড়লমশাই?

এই ধরুন আমি যেমন চামড়ার কর্ম করি,
আপনি যেমন ভোট পাবার জন্যে ছুটোছুটি করো,
আমাদের দাদাঠাকুর যেমন কেত্তন গেয়ে বেড়ায়,
তেমনি মন্ত্রীবাবুও তো নিশ্চয়ই একটা কিছু করে
নিজের পেট চালিয়ে থাকেন—
তা সে কর্মটা কি ?'

মোড়ল, জেলাধীশ—সবাই হতভম্ব।
আর প্রদর্শনী-সচিবের মাথায় তো একেবারে বজ্রাঘাত।
গতকালই তিনি নিজে একটি ঘণ্টা ধরে
ঐ চামারকে বুঝিয়েছেন যে, মহানুভব মন্ত্রী এলে
সে যদি তাঁকে প্রণাম জানিয়ে সবিনয়ে কথাবার্তা বলে—
তাহলে তার পক্ষে সরকারী পুরস্কার মিলতে দেরী হবে না একটুও।
কারণ, সে একজন সত্যিকার গুণী ব্যক্তি।
তখন ব্যাটার অভিব্যক্তি দেখে
আর ক্রমাগত হ্যাঁ-হুঁ শুনে—সেক্রেটারী ভেবেছিলেন
তাঁর কথামতই কথাবার্তা চালাবে চামার মন্ত্রীর সামনে।
কিন্তু এখন দেখছেন নটোবর উল্টো গায়।
মন্ত্রী কী কাজ করে পেট চালায়
ও তাই জানতে চায়।
বেচারা সচিবের চাকরীকে এবার লাকরির হাত থেকে
কে বাঁচায় ?

কিন্তু সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে
স্মিত হাস্যে চামারের প্রশ্নের জবাব দিলেন
এবার মন্ত্রী স্বয়ং।

বললেন—'আমি দেশ শাসন করি।'
'আর আমি চামড়ার আসন গড়ি গো।
আচ্ছা, শাসন করা কি আসন গড়ার চেয়েও বড় কাজ?'
নটোবরের উৎসাহ-উদ্দীপ্ত প্রশ্ন।
একটু থেমে সে আবার বলতে থাকে—
'শাসন তো সবাই করে বাবুমশাই,
বাপ ছেলেকে শাসন করে, গুরুমশাই পড়ুয়াকে শাসন করে,
দারোগাবাবু চোর-খুনেকে শাসন করে,
মোড়লমশাই চাষাভূষোদের শাসন করে,
দেশে কি আর শাসন করার লোকের অভাব?
আপনি আর এমন কি কঠিন কর্মটা করে থাকো মন্ত্রীমশাই?
কিন্তু ডেকে আনো তো দশখানা গাঁয়ের মানুষকে—
দেখি নটোবর চামারের মতন চেয়ার আর মোড়া ঢাকার
আসন বানাতে পারে কয়জন।
এই তো, আপনিও তো নাকি দেশ শাসন করে থাকো—
আর তা নাকি একটা মস্ত কর্ম।
কই, আপনি বানাও দেখি একখানা আমার মত চামড়ার আসন
কেমন পারো?
ঠিক অমনি একটা যোয়ান মেয়ের টস্‌টসে মুখ থাকতে হবে
আসনের মাঝখানে, যেমনটি আমি করেছি।
ঠিক অমনটি চোখ বানাতে হবে, ঠিক অমনটি ঠোঁট।
কই বানাও দেখি! পারবে?'

পেছন থেকে সচিব এসে এক হেঁচকা মারলো চামারকে
'এই নটোবর, চলে আয় এদিকে, কী হচ্ছে সব?'
নটোবর উল্টো ঝট্‌কায় সচিবের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে

আর একবার শুধালে একই প্রশ্ন—
'কি গো বাবুমশাই ? বলো, জবাব দাও। পারবে ?'

তটস্থ, সন্ত্রস্ত মোড়ল নিম্নকণ্ঠে মন্ত্রীকে নিবেদন করলো-
'এরই হাতের তৈরী কুশন আপনি কিনেছেন, স্যার।
একেবারে অজ পাড়াগেঁয়ে ভূত, ভদ্রলোকের সঙ্গে—'

অস্ফুটস্বরে মন্ত্রী আকাশ থেকে পড়লেন—'বলেন কি ?
এসব লেদারক্র্যাফ্‌টের শিল্পী এই লোকটা ?'
মন্ত্রীমশায়ের ইউরোপ-আমেরিকার খোয়াবের কপালে
আড়াই পোয়া ওজনের খোয়া এসে লেগেছে আর কি—
তাই বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠেছে।
মন্ত্রী তাড়াতাড়ি নটোবরের প্রশ্নের উত্তর দিলেন—
'তাই কি পারি ?
তুমি আসন বানাও, তুমি কি শাসন করতে পারো ?'
হেঁ হেঁ হেঁ—চামার তার বাব্‌লা-ঘষা ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলো
বের করে এবার হাসতে হাসতে বললো—
'এজ্ঞে এই কথাটাই আপনি বুঝিয়ে দাও তো
ঐ মোড়ল আর ঐ হাকিমবাবুকে।
আপনি তোমার কর্মে বড়, আমি আমার কর্মে বড়।
তবে, আপনি যদি আমাকে সালাম না দাও,
আমি তোমাকে সালাম দিতে যাবো কেন গো বাবুমশাই ?
সমানে সমানে আবার সালাম দেওয়াদেয়ি কি ?'

সমানে সমানে ? বলে কি চামারটা ?
মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রীর সঙ্গীদের চক্ষুও ছানাবড়া।

এস্. পি. ভাবছেন—'এখনই' যদি ব্যাটাকে অ্যারেস্ট না করি
তবে তো আমার সাস্‌পেন্‌শন অর্ডার এলো বলে।
এতবড় জাঁদরেল মন্ত্রীর সমান সমান কিনা এক চামার?
রাস্তায় দাঁড়িয়ে মহামানীর মানহানি—
কি ভয়ানক ব্যাপার!
কিন্তু আই. পি. সি.-র কোন্ সেক্‌শনে পড়ে এটা?

নটোবর ডান কানের বিড়ি বাঁ কানে গুঁজে
কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মুখ বুজে।
তারপর, হঠাৎ আবার শুরু করলো—
'জানেন গো মন্ত্রীবাবু,
আমার ঠাকুরবাবা, ঐ তোমরা যাকে ঠাকুরদা বলেন গো,
তিনি পাঠশালে পড়ে বিদ্বেন হয়েছিল।
ঘরে বসে অনেক শাস্তর টাস্তর পড়তো দেখতাম।
তিনিই একদিন রেতের বেলায় আমাকে বলেছিল—
'ছাখ্ নটোবর, এই পিরথিবিটা একটা মস্ত যাত্রাগানের আসর রে,
এখানে কাউকে রাজার অ্যাক্টো করতে দেওয়া হয়েছে,
কাউকে পেরজার। কাউকে রাণীর, কাউকে বা ঘুঁটেকুড়ুনীর।
যে যার নিজের অ্যাক্টোটুকু ভাল করতে পারলেই হল।
রাজার চেয়ে পেরজা তখন আর ছোট নয় কোনো দিক থেকেই।
আমার ঠাকুরবাবা আজ আর বেঁচে নাই বাবুমশাই—
কিন্তু তাঁর সেই কথাটা আমার বুকে গাঁথা রয়েছে।
আমি তো আমার অ্যাক্টো খুব ভাল করেই করেছি
এই যাত্রার আসরে—
চামারের অ্যাক্টোতে তো আমি সেরা হতে পেরেছি।
তবে? তোমার চেয়ে আমি কেন ছোট হবো গো মন্ত্রীমশাই?

লোকান্তরিত ঠাকুরবাবার শ্রদ্ধেয় স্মৃতিতে
নটোবরের দু চোখে অশ্রুর মেঘ থম্ থম্ করছে।
মন্ত্রীর দুই নয়নও আজ অদ্ভুত এক অনুভূতির আক্ষেপে
সহসা কেন যেন সজল হয়ে উঠলো।

আকাট এক মুখ্যুর মুখের অকাট্য এক যুক্তির দীপ্তির
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

এই দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চের দুই নট—
এক নগণ্য চামার আর এক বরেণ্য মন্ত্রীর চোখ
একই সঙ্গে একই লবণাক্ত জলে ভিজে আজ যেন
একই কথা বলে উঠতে চাইল একযোগে।

যাবার আগে মন্ত্রী হাত চেপে ধরলেন চামারের।
ফিস্ ফিস্ করে বললেন—'ভাই,
তুমি চামার আমি ব্রাহ্মণ।
তবু তোমার সেই পরমব্রাহ্মণ ঠাকুরবাবাকে
আমার হৃদয়ের প্রণতি জানিয়ে গেলাম।
ভাবছি, দেশের সবাই কবে তোমার মত
তোমার ঠাকুরবাবার কথাকে বিশ্বাস করতে শিখবে।'

পার্থক্য

রাজহংসের মতন ধবল মস্ত মটোরে চড়ে
বনানী চলেছে দিগ্‌বিজয়িনী রাজহংসীর দাপে।
চোখে সাদা ফ্রেমে কালো কাঁচ আঁটা দামী সান্‌গ্লাস্‌-দ্যুতি।
ডাই করা চুলে হাই করে ফুল তুলেছে হেয়ার-ড্রেসার।
ওষ্ঠ-গণ্ডে গোষ্ঠ গাইছে লাল লিপ্‌স্টিক্‌ রুজ্‌।
আধখানা খোলা শুভ্রবক্ষে ঝক্‌মকে হীরাগুলো
করে চোখ টেপাটেপি—।
নীল নাইলনে নামে শুধু ঢাকা বনানীর দেহ-ম্যাপ।

বয়েস হয়েছে বটে।
গত ফাল্গুনে পড়েছে একান্নতে।
তবু বক্ষের জোড়া মঙ্গল ঘটে
পড়তে দেয় নি এখনও ভাঁটার টান,
মেক্‌-আপের সেঁকে আজও রূপে তার চৈত্রীহাওয়ার গান।

মহানগরীর নাগর-নাগরী—সবারই সে পরিচিতা।
নাম শুনে তার কাম-উচ্ছল শত তরুণের প্রাণ।
তরুণীরা তারই ঢং-এ বাঁধে চুল
শাড়ি পরে তারই ছাঁদে,
ব্লাউসের নাম তারই নামে রাখে তারা।
বাজারে বেরুলে ভিড় জমে দিকে দিকে।

তারই ছবি ছেপে হাজারে হাজারে পত্রে পত্রিকায়
সেদিনও বেচেছে সম্পাদকের দল।
নিত্য এসেছে ঝুড়ি ঝুড়ি চিঠি কত দূর দূর থেকে।
সব চিঠিতেই স্তুতির মধ্যে বাসনার উত্তাপ।
ব্যাঙ্কে জমেছে বেশ কয়লাখ টাকা।

রিজেণ্ট পার্কে প্রাসাদ উঠেছে গড়ে।
শয়নকক্ষ এয়ার-কণ্ডিশণ্ড।
খান্ তিন আছে নয়া মডেলের দুনিয়ার সেরা গাড়ি
ফ্যান্-ফোন্-ফান্—
অভাব কি আছে কিছু?
ফল—ডিম—দুধ—পুডিং—বীয়ারে
ঠাসা ফ্রিজেডার খান্।
বয়, বাবুর্চি, সোফার, দাসীতে গম্‌গম্ করে বাড়ি

তার গান, নাচ, অভিনয়কলা দেখে
মুগ্ধ হয়েছে লক্ষ পুরুষ নারী।
রঙ্গমঞ্চে, সিনেমা-রজতপটে
কণ্ঠে কণ্ঠে জয়গান শুধু ধ্বনিত হয়েছে তারই।

মাত্র বিগত দুটি বৎসরে তার
হয় নি চিত্রে নামা।
ল্যারিংসে নাকি ধরেছে কঠিন ব্যাধি,
হুঁশিয়ার ডাক্তার
বার বার তাই করে দিয়েছেন মানা—
বিশ্রাম দিতে হবে নাকি গলাটাকে।

কমলালয়ের অদূরে থাম্‌লো গাড়ি
বনানীরই নির্দেশে।
ট্রাম-বাস সব বন্ধ হয়েছে—
গিজ গিজ শুধু লোক।
কিসের এমন ভিড় ?

গাড়ি থেকে নেমে, একটু এগিয়ে, ফাঁক পেয়ে, উঁকি দিয়ে
বনানী অবাক্—ওমা !
ও যে শুধু এক মেয়ে !
এতগুলি চোখ পাগল হয়েছে তুচ্ছ কারণে ঐ ?

হিসেবী দৃষ্টি ফেল্‌ল এবার বনানী মেয়ের দিকে।
বয়স অবশ্য কম।
উনিশ কি বিশ হবে।
বড় বড় চোখ আকর্ণ-বিস্তৃত।
নিটোল কপোল নাক।
শঙ্খবর্ণ তনুলতা ভরা পুষ্পিত যৌবন
হাস্যে লাস্যে উচ্ছ্বাস-উত্তাল।

বনানীর পাশে—
হাতে বই নিয়ে ভিড় করে আছে কলেজের ছেলেগুলো।
সবার দৃষ্টি মেয়েটির দেহে গাঁথা।
ওদেরই মুখের ভাষার ভাষ্যে বোঝা গেল—ঐ মেয়ে
নতুন নেমেছে সিনেমার পর্দায়।
নতুন ফিল্মে ওর অভিনয় অতুল হয়েছে নাকি।
একটি ছেলে তো বললেই বাজি রেখে—
এমন অ্যাক্টিং সম্ভব নয় কারু পক্ষেই আর।

অফিস ফেরতা মধ্যবয়সী এক
তাড়াহুড়ো করে এগুতে যেতেই
লাগলো প্রবল গুঁতো
বনানীর কটিদেশে।
কুণ্ঠা কোথায়। ভদ্রলোক তো উল্টে চটেই সারা—
নবীনা নটীকে দেখতে তখন দুই চোখ দিশাহারা,
বনানীর দিকে সরোষ নয়নে চেয়ে
বললে খিঁচানো মুখে—
'আ ম'ল, আবার এ বুড়ী মরতে এসেছে কেন এ ভিড়ে?

তার চিৎকারে যুবকের দলও মজা পেলো যেন কিছু,
তাকালো ফিরিয়ে চোখ,
মুখ টিপে হেসে বললে তাদের কেউ—
'রং মেখে বুড়ী ছুঁড়ী হতে চায় ছাখ।'
কেউ দিল টেনে শিস্।
'লজ্জাও নেই।'—কেউ করে ফিস্ ফিস্।

নিভে গেল আলো, থেমে গেল যেন সব নহবত-তান
বনানী-মনের দর্প-দেউলে আজ।
প্রবীণা-নারীর নেই কি কোনই দাম?
কালও যে ছিল এ নগরীর শত নয়নের মণি হয়ে,
গীতি, নৃত্য ও অভিনয়ে সব সেরা,
যার স্তুতিবাদে মুখর ছিল এ দেশের অযুত লোক—
আজ তাকে দেখে চিনেও চেনে না এরা?
বয়েসের দাগে ঢাকা পড়ে গেল বুঝি তার গুণ সব—
এত নাচ, গান, অভিনয়-উৎসব?

আজ সকলের চোখে ভাসে ঐ নতুন মেয়ের ছায়া,
মানুষের ভিড়ে তারই জয়জয়কার।
আর, ওরই পাশে, বিগত দিনের শ্রেষ্ঠা রূপসী-নটী
পেলো শুধু উপহাসের পাত্র-ভরা
নিষ্ঠুর অবহেলা!
তাচ্ছিল্যেতে পিচ্ছিল যত হাসি-টিট্‌কিরি-শিস্!
এদেরই ভোগের সামগ্রী হয়ে বনানী সেজেছে কত?
কত রং-এ কত ঢং-এ কটাক্ষ হেনেছে অহর্নিশ?

ফেরার মুখেতে, ভবানীপুরের শেষে
গাড়ি গেল থেমে আবার কিছুক্ষণ।
সামনে অদূরে সাজানো বরের ময়ূরপঙ্খী-কার।
শানাই বাজছে বিদায় রাগিণী নিয়ে।
বাপ-মাকে ছেড়ে চলেছে কন্যা
পতির আলয়ে আজ।
যেমন স্বামীটি রূপবান,
ঠিক তেমনই রূপসী কনে—
ঘোম্‌টা-সিঁদুরে, শাঁখায়-নোয়ায়
বিজয়ের বাণী লেখা,
যুবা-পুরুষের হৃদয়-জয়ের বাণী।

ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়েছে বর-বধূ।
সাশ্রু নয়নে এসেছেন বাবা-মাও।
বুকের ধনকে বুকছাড়া হতে চায় কি দিতে ও-প্রাণ?
পুরনারী সবে তুলেছে শঙ্খরব,
শত পরিজন-বুকে বিদায়ের ব্যথা।

সজল-চক্ষে কন্যা নামায় শির
পদধূলি নিতে জনক ও জননীর।
থর থর করে কাঁপছে মায়ের হাত,
তবু সেই হাত মাথায় ছুঁইয়ে
বললেন কন্যাকে—
'হও সতী-সীতা-সাবিত্রীসমা মাগো!'

সানাই-এর বোলে শঙ্খের রোলে তাঁর সে আশিস্‌বাণী
দিক দিগন্তে তুলল কাঁপন যেন।

মুগ্ধ বনানী, স্তব্ধ দু-চোখ তার—
সতী-সাবিত্রী-সীতাও ছিল তো মেয়ে!
যুগ যুগান্ত পরেও তো তারা বৃদ্ধা হয় নি আজও,
তাদের মহিমা আজও আছে অক্ষয়!
আর—শুধু দুটি বছর পারে নি নামতে সে সিনেমাতে
তাতেই বনানী দাম-নাম-হীনা বিস্মৃতা দুনিয়ায়!
বৃদ্ধা সে আজ, ধিক্ ধিক্ তাকে করে রাস্তার লোক?

রাজহংসের মতন ধবল মস্ত মটোরে বসে
রাজহংসীর মতন শুভ্রা নারী—।
ধীরে ফিরে চলে গাড়ি।
বেদনাশ্রুতে ছল্‌ছল্ করে অতীত নটীর চোখ।

আবিষ্কার

শ্রাবণের বর্ষণের ধর্ষণে কলঙ্কিতা কলকাতার
স্বেদাক্ত ক্লেদাক্ত শত গলি-রাজপথ।
রাত্রি হয় হয়।
শেয়ালদা কোর্টের সামনেকার রাস্তাটা
দ্রুতপদে পার হতে গিয়েই সেই ঝঞ্ঝাট।
'চার আনা পয়সা দেবেন বাবু দয়া করে—
পোয়াটেক দুধ দিতাম, ভাইটা মরে মরে।'
যে হাতের প্রার্থনা দুধের জন্যে শুধু চারটি আনা
বর্ণ তারও দুধেরই কাছাকাছি।
মুহূর্তের জন্যে থামলো কেষ্ট জানা।
অভাবের প্রভাবের দাপট সর্বাঙ্গে সুস্পষ্ট,
তবু, কিশোরীর কৃশতনুতে কৃপণতা নেই
অনঙ্গ-আশিসের,
নয়নে-বয়নে তার নবমুকুলিত যৌবনের
সুললিত তরঙ্গের বিলোল কল্লোল।
রাজনীতির জুয়াখেলায় এদেরই প্রাণ মান
বুঝি বাজি রেখেছিল হৃতবীর্য
বোকা যুধিষ্ঠিরের দল—পদ্মার ওপারে?

পকেট ভরা টাকা নিয়েই ফিরছিল জানামশাই।
কালোবাজারি এলোপাতাড়ি আয়ের পয়সা,
চার আনা কেন, চারটি টাকা দিতেই কি সে পেছপা-

যদি দুধের মত রং-এর দেহটাকে সুদে খাটাতে
রাজী থাকে মেয়েটা।
কিন্তু—সে আশা যে নেই
তা জানার অজানা নেই।
এরা ফুটপাতের ওপরকার ঐ ইঁদুরের গর্তের
মত খুপরীগুলোর মধ্যে কুত্তার মত ধুঁকে ধুঁকে মরবে,
তবু, দেহকে পণ্য করতে বড়ই কার্পণ্য।
কবে যে গভর্ণমেণ্ট সাবিত্রী সীতার মত
জঘন্য চরিত্রগুলো বাদ দিয়ে
মহাভারত-রামায়ণের নবরূপায়ণে
সচেষ্ট হবে—জানা সেই কথাই ভাবে।

কিন্তু সে ভাবনায় এখন লাভ নেই।
অতএব—একটি ধমক।
এবং তারপরেই ডাহা মিথ্যে কথা—
'পকেটে একটি ফুটো পয়সা নেই
তো চার আনা।
পায়ে হেঁটে চলেছি দেখছো না?'

ভীরু হাতখানি সসঙ্কোচে পিছিয়ে গেল,
মিলিয়ে গেল আধো আঁধারে পরক্ষণেই।

'আরে এই যে কেষ্টবাবু না?'—
ট্রামলাইনের দিক থেকে অন্তরঙ্গ ডাক।
তারপরেই একেবারে এসে হাত চেপে ধরা—
'চিনতে পারছেন স্যার?'

চিনতে অবশ্য চেষ্টা করেও পারলো না জানা।
কিন্তু কালোবাজারীর এলোপাতাড়ি আয়ের পথে
চলতে গিয়ে সত্যি কথা বলতে আছে মানা—
সে সত্যটুকু অজ্ঞাত নয় কেষ্টর,
এ-পথে কার হাত দিয়ে কখন যে আয়ের পথ
উন্মুক্ত হয়—স্বয়ং বিধাতাও বোধ করি তা বলতে অক্ষম।
একটু হেসে তাই জবাব দিল কেষ্ট—
'আহা, তা আর চিনছি না?
তারপর, কি খবর?'

'আরে খবর বড় জবর।
চারশোটা টাকা ইন্‌ভেষ্ট করবেন?
কালই আটশো হয়ে ফিরে আসবে ঘরে।'

'বলেন কি? আটশো হয়ে?
তা দিন না দেখে শুনে, আমি এখুনি রাজী।'

'কেরোসিনের কথা বলছিলাম স্যার।
বড়বাজারে মাল মজুদ।
বাজারে কেরোসিনের অবস্থা দেখছেন তো?
একেবারে হাহাকার।
আজ চারশো দিয়ে আমিই কিনিয়ে দেবো,
আবার সে মাল আমিই বেচে দেবো কাল আটশোয়।
এই অধম নিবারণকে যা খুশি দেবেন স্যার।'

বড়বাজারের সোনাপট্টির কাছাকাছি গলিটা।
মোড়ের মাথায় জানাকে দাঁড় করিয়ে রেখে

চারশো টাকা নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হল নিবারণ
কেরোসিনের কালোবাজারের গুপ্ত গর্তে
তেল সংগ্রহের ব্যস্ত আগ্রহে।

আটটা থেকে এগারোটা—
নিবারণের এই নিদারুণ বিলম্বের কি কারণ?

কারণ জানতে পদচারণই সার।
কেষ্ট বুঝতে পারলো এবার—
তাকে বিন্ধ্যপর্বত বানিয়ে দিয়ে
অগস্ত্যমুনি অগস্ত্যযাত্রা করেছে।

শূন্য পকেটে বাড়িতে ফিরে
যখন রোষে আর আফসোসে
ফোঁস ফোঁস করছে ঠগ-এর হাতে
ঠকে আসা কেষ্ট জানা—
তখন মনের সেই ভয়ানক অবস্থার
মধ্যেও তার একটা কথা হঠাৎ
মনে পড়ে গেল।
অবিশ্বাস্য রকমের অদ্ভুত সে-কথা।
মনে পড়লো—
সেও তো মিথ্যে কথায় ঠকিয়েই এসেছে
সেই মাত্র চারটি আনার প্রার্থিনীকে
মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে।
পকেট ভরা টাকা থাকা সত্ত্বেও সে যে বলেছিলো—
ফুটো পয়সাও নেই তার কাছে.

বোধহয়—চারটি আনা খসাতে হয় পাছে
সেই ভয়েই।

আরও অবাক লাগলো কেষ্টর আর একটি অদ্ভুত
ব্যাপার চিন্তা করে।
যে-বেচারী সত্যি কথা সবিনয়ে নিবেদন করে
মাত্র চারটি আনার আকুল আবেদন জানালো
সলজ্জ-সঙ্কোচে—
তাকে সে কিন্তু দিল না কানাকড়িও,
অথচ নির্লজ্জ মিথ্যায় প্রলুব্ধ করে
চারশোটি টাকা যেই চাইল এক অপরিচিত ঠগ্
অমনি নির্দ্বিধায় তার হাতে তুলে দিল সে
অতগুলি টাকা পকেট উজাড় করে।

সত্যকে একটু আগে ঠকিয়ে এসে
মিথ্যের কাছে এই যে সে আজ ঠকে গেল নিজেই
এতে কেষ্টর মনে যতটা ক্ষোভ এলো
তার চেয়ে ঢের বেশি বিস্ময় জাগলো তার
হঠাৎ নতুন এক তত্ত্ব আবিষ্কার করে।

এ দুনিয়ার বেচাকেনার হাটে—
সত্য আজ দাম পায় না মাত্র চার আনাও,
আর, মিথ্যা মুহূর্তে বিক্রীত হয় চারশো টাকাতেও।

আশ্চর্য

আমি একজনকে জানি—
তাকে তার কৈশোরে দেখেছি সত্যনিষ্ঠ, প্রত্যয়বলিষ্ঠ
এক পবিত্র হোমাগ্নিশিখার মত উজ্জ্বল।
পল্লীর সে সবার সেরা।
তা সে দরিদ্র সেবাতেই বলো, আর কচিকাঁচাদের
নিয়ে বিরাট দল গড়ার ব্যাপারেই বলো।
ঐটুকু ছেলের লেখা গান গেয়ে
পাড়ার যোয়ান-বুড়ো পুরুষ-নারী বেরোয় প্রভাতফেরীতে।
ওরই লেখা নাটক 'বালসেনা'
যেদিন প্রথম মঞ্চস্থ হ'ল
নগরীর শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়ে
বিখ্যাত বিদগ্ধজনের উৎসুক উপস্থিতিতে,
সমবেত সুধীদের মতো আমিও বিস্ময়বিমুগ্ধ
না হয়ে পারি নি সেদিন।

পরদিন—
সমস্ত দৈনিক ওর নাটকের প্রশংসাতে পঞ্চমুখ।
অথচ—
ওকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না সেই খ্যাতি আর খাতিরের ভিড়ে
একি তার ভীরু লাজুকতা?
অথবা যশের কাঙালপনা অসহ্য তার কাছে?

ইংরেজি বল্‌তো সে বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল।
হিন্দি লিখতো ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে অক্ষরে।
বাংলা, উর্দ্দু, ফার্সি, আরবী, লাটীন, হিব্রু, ফ্রেঞ্চ—
সব ভাষাতেই সমান পারঙ্গম।
বক্তৃতা দিতে উঠলে—
থমকে থামতো শ্রোতৃ-কলরব।
দেশের নামজাদা সাংস্কৃতিক আর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে
তাকে বক্তা হিসেবে দেখেছি অনেকবার।

সে ছবি আঁকতো, আবৃত্তি করতো, গীটার বাজাতো,
তবলায় বোল্‌ তুল্‌তো পরম মুন্সীয়ানায়,
পূজোর সময় ঢাক্‌ বাজিয়ে তাক্‌ লাগিয়ে দিত ঢাকীদের।

অথচ, বছর কয়েক পরে—
তাকেই একদিন দেখলাম আসামীর কাঠগড়ায়।
মিথ্যা ছলনায় টাকা নেওয়ার অপরাধে
সে অভিযুক্ত।

কৈশোরে যে সত্যনিষ্ঠ, প্রত্যয়বলিষ্ঠ,
অতগুলি গুণে গুণান্বিত,
যৌবনের মধ্যাহ্নে সে প্রতারক, প্রবঞ্চক।
এমন হ'ল কেমন করে?

জেল্‌-এ গিয়ে দেখা করলাম একদিন।
শুধালাম—'শেষে তোমার মত ছেলেও
হারিয়ে গেল অন্ধকারে?'

কোঁকড়া চুলে ঢাকা কপালের নীচে
মস্ত দুই চক্চকে চোখ একটু যেন হেসে উঠল
বলে মনে হ'ল তার।
আর তারপরেই নড়ে উঠল ঠোঁট।
বললে—'অন্ধকার যে কেবল অন্ধকারই নয়
সেটা তো বুঝতে পেরেছি।
তাতেই আমি খুশি।
সুনামে লোভ ছিল না কোনো কালেও
দুর্নামেও তাই দুর্ভাবনা নেই একটুও।
আলোর মত অন্ধকারও যে সত্য, সেকথা তো মিথ্যে নয়।
সেটাকেই দেখে নিচ্ছি ভাল করে।'

'তাই বলে লোক ঠকিয়ে?'
আমার বিদ্বেষবিস্মিত প্রশ্ন।

'অন্ধকারের অভিজ্ঞতা অর্জনের মূল্য দিতে হয় যে টাকায়।
সারা পৃথিবীটা ঘুরে এলাম, শোনো নি?
তার খরচ কে যোগায়?'

বলে একটু নীরব হ'ল সে।
চোখের রেখায় অশ্রু ঘনায় বুঝি।
বাষ্পরুদ্ধস্বর শোনা গেল এরপর।
'কাউকে কি কেউ ঠকাতে পারে?
ঠকাতে গিয়ে ঠকেছি আমি নিজেই প্রতিবার;
সেটা বুঝবার বুদ্ধিটুকুও কি গত ভাবছ আমার?

টাকা সবার ফেরত দেবো একদিন নিশ্চয়ই
তা জেনেই এই টাকা নেওয়া।
কিন্তু তাতে তো তাদের ভালবাসা আর ফেরত পাবো না কখনও।'

একটা অতি দীর্ঘ শ্বাস—
যেন অক্টোপাসের মত শুঁড় বের করে
তেড়ে আসতে চাইল আমার মনের সেই কোণটায়
যেখানে ওর কৈশোর চিত্র আজও খোদিত
সপ্রশংস বর্ণাঢ্য বিভায়।

'এবারে আমি যাবো
পেছনে প্রহরীর তাড়া—'
জানালাম তাকে,
'আর কিছু কি বলার আছে তোমার ?'

'আছে।'
কোঁকড়া চুলে চোখ দুটোও কি ঢাকা পড়লো শেষে ?
নাকি—ওই সচেষ্ট অশ্রু লুকোতে কেশে ?

'বোলো সবার কাছে—
অন্ধকারের খবর নিয়ে আলোতে ফিরবো যেদিন,
অনেক অশ্রুর বিনিময়ে কেনা এই আলো-আঁধারের
মিলিত অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান
তুলে ধরবো সেদিন সবার সামনে।
তারপর বিচার করে যেন দেখে সবাই—

সদাসচেতন উদ্দেশ্যের চাল মনের সম্মুখে রেখে
অন্ধকারে বিহার করে যে,
'অন্ধকারের কালোও তাকে কালো করতে পারে কি না।'

কারার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে
অবাক হলাম নিজের অন্তরের পানে তাকিয়ে।
এতগুলি কথা শুনে এসেও
সেখানে কেবল একটিমাত্র প্রশ্নেরই প্রচণ্ড আলোড়ন-

সুনামে ওর লোভ ছিল না কোনো কালেই,
দুর্নামেও বুঝি তাই দুর্ভাবনা নাই একটুও?

আশ্চর্য।

ব্যর্থ বজ্র

নিজের বক্ষপঞ্জর বিদীর্ণ করে
তারি অস্থি তুলে দেবতাদের হাতে দিতে
কী দুঃসহ যন্ত্রণা যে হাসিমুখে সহ্য করতে হয়েছিল দধীচিকে
তার কথা পুরাণ লেখে না।
সচেতন অবস্থায় নিজের সুস্থ দেহের সবল অস্থিকে
বাইরে টেনে বের করার কত যে বেদনা,
কত যে জ্বালা—তা পুরাণ না বলুক,
তোমরা তো জানো!

আর জানো বলেই বোধহয়
কখনও কাব্যে কখনও সাহিত্যে
দধীচিকে বাহবা দিয়ে বসো হঠাৎ।
অথচ দধীচি কিন্তু বাহবা চান নি একবারও।
তিনি দেখতে চেয়েছিলেন—
দেবতাদের ধারণা সত্যি কতখানি।
তাঁর অস্থি দিয়ে যে-বজ্র তৈরী হবে তাতেই নাকি
বিনাশ পাবে অসুরকুল
নিশ্চিহ্ন হবে দুর্জয় শয়তান,
দেবতাদের এই প্রত্যয়কে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন
মহাযোগী,
নিজের অস্থির মূল্যে এও এক মহার্ঘ এষণা।

কিন্তু ব্যর্থ হ'ল অস্থিদান।
শয়তানের হ'ল না সর্বনাশ।
ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে আজও তার অস্তিত্ব স্বীকৃত সর্বত্র
আজও শয়তান অসুরের দল নানা দেশে নানা বেশে
বার বার তচ্‌নচ্‌ করে দিচ্ছে কত নিরীহ সাধকের
কঠিন সাধনায় গড়া সাফল্যের যজ্ঞবেদী।
বজ্র তার কিছু ক্ষয় করতে পেরেছিল মাত্র—
লয় তার হয় নি কখনও।

দেবতাদের প্রত্যয়ের প্রত্যন্তপ্রদেশে
হয়তো ভগবানেরই ভুল ছিল বারো আনা।
দেবতারা যেমন তাঁর সৃষ্টি,
অসুর কুলেরও সৃষ্টিকর্তা তেমনি তো তিনিই!
দৈবশক্তিধরদের যুগে যুগে যেমন প্রেরণ করেছেন ভগবান
সুন্দর বসুন্ধরাকে সুন্দরতর করে' তোলার প্রচ্ছন্নপ্রয়াসে
ঠিক তেমনই, তিনিই আবার
লক্ষ লক্ষ দক্ষকে পাঠিয়েছেন শিবহীন-যজ্ঞের
অশুভ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে।

এই সৃষ্টিলীলা অনাদি অনন্ত।
এ দুটির কোনোটিকেই নিঃশেষে বিলুপ্ত করার শক্তি
স্বয়ং স্রষ্টারই কি আর আছে?

অস্থি-অশনির শক্তি কতটুকু!

সব বুঝেও, এক অতি সাধারণ দুর্বল মানুষ আমি—
সহসা এক মোহময় মুহূর্তে
সংকল্প করে বস্‌লাম—করবো অস্থিদান।

কঠোর তপস্যাপূত দিব্যপাবকদীপ্ত অস্থি আমার নয়।
সহস্র-কামনা-তাড়িত মায়ামোহ-নিপীড়িত
অতি নগণ্যের ঘুণ ধরা স্বস্তিহীন অস্থি আমার,
এ অস্থিতে বজ্রের নির্ঘোষ আস্‌বে কোথা থেকে ?

তবু সংকল্প অটুটই রইল।
মনের ভেতরকার অশান্তটা বললে—
মাভৈ মাভৈ,
স্বস্তিহীনতায় দগ্ধ যে অস্থি, সে-অস্থির মজ্জায় মজ্জায় আছে
প্রলয়বহ্নির বিপুল সজ্জা,
তার দাহ্যশক্তিকে গ্রাহ্য করবে না
এমন শক্তি বিরল পৃথিবীতে।

স্থির হ'ল, আমার অস্থির বিনিময়ে
শয়তানের বিষাক্ত বিবরের বিশদ বিবরণ
সংগ্রহ করা হবে প্রথমে—
তারপর শুরু হবে মুখোশাসুর মর্দন।
মুখোশকে ছিন্নভিন্ন করে দিলেই শয়তানের বিকট রূপ প্রকট হবে,
দেশের শক্তিমানদের কর্তব্য দেখা দেবে তার পরেই,
আর তখনই পড়বে আমার এ অস্থিযজ্ঞে শেষ আহুতি।

স্ববক্ষ বিদীর্ণ ক'রে পঞ্জরাস্থি উৎপাটন করলাম একদিন
মনের মধ্যেকার সেই অশান্তটার দুরন্ত তাগিদে

যে-অশান্তকে অভ্রান্ত বলে মেনে এসেছি আশৈশব।
যৌবনারম্ভ মুহূর্তে, সৌকুমার্যভরা মনের
নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক অস্থিকে বস্তিচ্যুত করার সময়ে
কী নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠেছে
চিরপবিত্রতায় দীক্ষিত হৃদয়-তন্ত্রীগুলি কতবার
তার হিসেব আজ আর মনে নেই।
শুধু, এইটুকু আজও ভুলি নি—
সে যন্ত্রণার জ্বালায় অশ্রুতে বালিশ গেছে ভেসে
রাতের পর রাত।

অস্থিযজ্ঞে প্রথমেই আহুতি দিলাম—সুনাম, সুকৃতিকে।
দ্বিতীয় আহুতিতে পড়লো—আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু;
সবার প্রেমপ্রীতিপ্রণয় থেকে বঞ্চিত হলাম চিরদিনের মত।
সব হারিয়ে, তৃতীয় আহুতির জন্যে যখন প্রস্তুত হচ্ছি—
মনোচারী সেই অশান্তটা প্রগল্‌ভ হ'ল।
বললে, সবই তো দিলে, দেবার বাকী কি কিছু আছে?
তোমার অস্থিদানপর্ব সম্পূর্ণ,
এবার যজ্ঞফলের প্রতীক্ষা করো।

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষাশেষে ফল মিলল।
শয়তানের বিষাক্ত বিবরের বিস্তারিত বিবরণ
নিয়ে, শ্রান্তিম্লান অনাহার-কুব্জ অবস্থায়
এসে সর্বসমক্ষে দাঁড়ালো যেদিন সর্বহারা এই অস্থিদাতা-
সেদিন দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ তার দিকে আঙুল দেখিয়ে
সবিদ্রূপরোষে চীৎকার করে উঠল—

'শয়তানের রাজ্য থেকে ও এসেছে,
ও নিজেও শয়তান!'

ব্যাকুলকণ্ঠে বলতে চেষ্টা করলাম—'ওগো, না, না,
শয়তানের গহ্বরে প্রবেশ করবো বলেই
শয়তানের ছদ্মবেশ ধরতে হয়েছিল আমায়
কয়েকদিনের জন্যে,
সে ছদ্মবেশ তো আমার আসল রূপ নয়।
আমি যে আগের মতই অপাপবিদ্ধ
নির্লোভ, নিঃস্বার্থ।
আমি এসেছি মুখোশাসুরের
জঘন্য কার্যকলাপের গোপন ঘাঁটির ভয়ানক
সংবাদ সংগ্রহ করে',
আমায় বলতে দাও সব কথা,
আমায় প্রকাশ করতে দাও, প্রচার করতে দাও
আমার সব হারিয়ে এই দীর্ঘ গবেষণার
ফলাফল, দোহাই তোমাদের!'

কিন্তু বৃথা হল সে চেষ্টা আমার,
বৃথা হল সব আবেদন নিবেদন।
তোমাদের পুলিশ, আদালত, সমাজ—
একযোগে বজ্রমুষ্টির চাপে আমার কণ্ঠরোধ করলো।
মন-মধ্যবাসী সেই অশান্তটাকে প্রশ্ন করলাম,
—এ কি হ'ল আমার?
নিঃশেষে নিজের সর্বস্বদান করার ফল শেষে এই?
কেন তুমি বললে অস্থি দিতে?

উত্তরে, এই সর্বপ্রথম হাসতে দেখলাম ওকে।
বাঁকা ঠোঁট আরও একটু বাঁকিয়ে সে বললে—
'আমি অশান্ত এ কথা মিথ্যে নয়,
কিন্তু অভ্রান্ত—এমন কথা বলেছি কি কখনও?'

অস্থিদান ব্যর্থ হ'ল এবারও।
শয়তানের মুখের ক্রূর হাসির গূঢ় রহস্য
অটুট, অমর, অব্যয় হয়েই রইল,
অক্ষয় রইল তার মুখোশের ফোঁস্ ফোঁস্।

মহামুনি দধীচির অস্থিবজ্রেও যে-অসুরের
অবলুপ্তি ঘটে নি,
আমার ঘুণ ধরা মর্চে পড়া নগণ্য অস্থিদানে
সে অসুরের কী বা হতে পারে!

অথচ

সাধারণতঃ প্রতারকের কোনও বন্ধু থাকে না।
এই বিরাট বিশ্ব তাকে নিঃস্ব বলেই ঘোষণা করে।
বাপ-মা, বন্ধু-ভাই, পুত্র-কলত্র সবারই অবিশ্বাস তার ওপরে।
কারণ, প্রতারক মানেই
কুমতলবের দরিয়ায় ডোবা মস্ত একটি ইঞ্চকেপ রক্—
যাতে ঘণ্টা বাঁধতে ভুলে গেছে অ্যাবট্ অফ অ্যাবারব্রথক্।
কখন কার ধন-তরী ঐ ডুবো পাথরে ঘা খেয়ে ভরাডুবি হবে
কে বল্‌তে পারে ?
তাই চুপিসাড়ে—
তাকে একলাই চল্‌তে হয়
সমাজের অলিতে গলিতে নগণ্য হয়ে,
অগণ্য শান্তিসুখের নীড়ের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে।

কিন্তু এই প্রতারকই যখন বন্ধু জুটিয়ে ফেলে হঠাৎ,
হঠাৎ একদিন দল গড়ে' বসে স্বগোত্রদের নিয়ে,
তখন সে হয়ে দাঁড়ায় দশাবতারের অন্যতম,
সমাজ তখন দরাজ তার প্রতি,
সে তখন অনন্য, অনুপম।

পুলিশ বেচারা ফুলিশ বনে গিয়ে
সব জেনে শুনেও নোক্‌রি সাম্‌লাতে

বলির বক্‌রির মত সভয়ে স্যালুট্ ঠোকে
সেই প্রতারক কুলপতিকে।

সেই প্রতারকেরই ওরেশন্ তখন ওভেশন্ পায় দিকে দিকে।
প্রেসের লোক তারই প্রেসের কাহিনী ছাপে কলাম্ জুড়ে।
দেশ ভেসে যায় তার অতুল যশের রসের বন্যায়।
কারণ সে তখন আর একক প্রতারক নয়,
দল তখন মহাবল তার।
মানুষ আবার দলের বল দেখে দুর্বল হয় নি কবে?

একান্তে, রঙিন চশমা খুলে মেলে ধরো কোনো ইতিহাস।
দেখবে—তার পাতায় পাতায় গাঁথা দীর্ঘশ্বাস।
এ-দীর্ঘশ্বাস সৎ মানুষের, সাচ্চা মানুষের।
তাদের কাহিনী চাপা পড়ে গেছে অধিকাংশ ঐ শ্রেণীর প্রতারকের
ঝল্‌মলে নাগরার নীচে

ইতিবৃত্তের ঘটনাবৃত্তে যারা স্বার্থসর্বস্ব, খুনী, বিশ্বাসঘাতক
তারাও কি প্রতারক নয়?
ভোটের বাক্সে যারা জমি কেনে নোটের বাক্সের কেরামতিতে,
মিথ্যা ভোটার সাজিয়ে চোখে ধূলো দেয় ডেমক্র্যাসির—
আইনতঃ পেনালকোড কি তাদেরও প্রতারকই বলবে না?

অথচ ওরাই দলের বলে রাষ্ট্রের হাল্ ধরে,
ওরাই বসুন্ধরার সব ভোগ্যটুকু ভোগ করে নিঃশেষে,
মরলে, ওদের নামেই তৈরী হয় স্মৃতি-সৌধ।

আর তুমি ?
কূলহীন অসৎ পারাবারের মধ্যে তুমি সততা আর শুচিতার
স্বল্পায়ু বুদ্‌বুদ্।
অতীতের ইতিহাসে—তুমি মূল্যহীন, অতি তুচ্ছ তাই।
ভবিষ্যতের ওয়াকিয়ানবীশও কি তোমার নাম উহ্যই রাখবে ইতিহাসে
গুহ্য স্বার্থের কারণে ?

উপলব্ধি

যখনই ভেবেছি—
আমার সমান কর্মা মহান নেই কোথাও,
আমার প্রভাবে ধরার স্বভাবে ধরেছে নতুন রং—
গির্জা-ঘণ্টা তখনই মনটা শুনেছে বেজেছে দূরে,
কবর দেবার খবরেতে 'নেল্' বেজে গেছে ঢং ঢং।

কিন্তু, কেন ?

নভেম্বরের নরম সকালে
খবর কাগজের গরম খবর—
"ভদ্রবেশী প্রতারক।
মুখে ইংরেজী বুলির ঝড়,
নামের পেছনে এম. এ., পি-এইচ. ডি-র ভর,
চেহারায় আভিজাত্যের তক্‌মা,
চোখে শেলের চশমা,
আসলে কিন্তু চিত্রগুপ্তের খতিয়ানে
তার নাম রয়েছে প্রতারকদের তালিকায়
লাল ঢেরাতে দাগানো।"

খবরের বহরে জবর শহর রসিয়ে উঠল।
রসিকজন ছুটে এসে জুটল কোর্টের বিচার ঘরে।
পুলিশ-প্রসিকিউশন ভয়ানক উত্তেজিত—
যেন গ্যালোজে তাদেরই একজিকিউশন্ হবে আর একঘণ্টা পরে।

যথাসময়ে প্রতারককে এনে দাঁড় করালো সেপাই কাঠগড়ায়।
সত্যিই সম্রান্ত ভাবের একটা ছাপ অস্পষ্ট নয় আসামীর চোখেমুখে,
ম্যাজিষ্ট্রেট একনজরেই ধরে ফেললেন।

পুলিশ প্রসিকিউটর স্বয়ম্বর সভার ভাট্‌-এর কাজ শুরু করলেন,
মুক্ত্রিম্-পরিচিতি।

কী ভীষণ মারাত্মক প্রতারক আসামী
তারই সবিশেষণ বিবরণ পরিবেশন।
মূল বক্তব্য কিন্তু তাঁর অতি ছোট।
আসামী দামী না হয়েও নামী সাজবার চেষ্টায়
নিজের নামের পেছনে মিথ্যে ডিগ্রীর লেজুড় জুড়েছে,
উদ্দেশ্য—প্রতারণা।

ডক্-এর ওপর দাঁড়ানো যুবক প্রতারককে
ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং প্রশ্ন করলেন—'তুমি পি-এইচ. ডি?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ।'
'বটে? কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের?'
'আজ্ঞে দেশের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ই যে এখন
নিঃস্বমিথ্যালয়ের রূপ নিয়েছে,
আমাকে ডক্টরেট দেবে তেমন দুঃসাহস কি তাদের হবে?
সেটা জেনেই, ও বস্তুটি নিজেই আমি নিজেকে দান করেছি।'

'ছ্যাবলামো হচ্ছে মাননীয় বিচারকের সামনে?'
টেবিল চাপড়ে দাবড়ে উঠলেন প্রসিকিউটর।
'সত্যি কথাকে কোর্ট-ভাষ্যে ছ্যাবলামো বলে নাকি উকিলবাবু?'
প্রতারক কণ্ঠ অনুত্তেজিত।
'হোয়াট্!' এবার আর চাপড়ে চলল না,
প্রচণ্ড কিল কিলোলেন সরকারী উকিল টেবিলকে।

'অর্ডার, অর্ডার।'
ম্যাজিস্ট্রেটের গুরুগম্ভীর রব স্তব্ধ করে দিল সব।
চোখের চশমাটা খুলে, রুমাল দিয়ে লেন্স মুছতে মুছতে

অনুতপ্ত স্বরে তিনি পুনশ্চ শুধালেন—
'তোমার যোগ্যতা থাকলে কেন দেবে না ইউনিভার্সিটি
তোমাকে ডক্টরেট্ ?'

'যোগ্যতা !'
আসামী প্রসিকিউটরের শাসানির সামনে দাঁড়িয়েও একটু হাসল।
বলল—'দ্বারকায় এক পাণ্ডার খাতায় জনৈক ডক্টরেট
বেশ কয়েক লাইন বাংলা লিখে রেখে এসেছেন,
পাণ্ডার প্রশস্তিপত্র।
সেটা নজরে পড়তেই পড়ে দেখলাম—
শব্দের পর শব্দ সে লেখায় ভুল বানানের কামান দাগ্‌ছে
সশব্দে।
ভদ্রলোক শুনেছি অপরাধ-তত্ত্বে পরমপ্রজ্ঞানী,
তাই হয়তো 'ডক্টরেট্' হয়েও তাঁর এই বানানবিভ্রমের
লজ্জাকর অপরাধ আপনাদের কাছে ক্ষমার্হ।
কিন্তু তাতেও তো যোগ্যতার মানযন্ত্রের পারদস্তম্ভ
ওপরে ওঠে না, নীচেই পড়ে থাকে।

অনুচ্চস্বরে ম্যাজিস্ট্রেট প্রায় স্বগতোক্তি করলেন—
'ইন্‌টারেষ্টিং !'
তারপরেই জিজ্ঞাসা করলেন আসল প্রশ্ন—
'কিন্তু এতগুলি মিথ্যে ডিগ্রী লাগিয়ে
নিজেকে পণ্ডিত বলে জাহির করার প্রয়াস তোমার কেন ?'
'আজ্ঞে, ডিগ্রীর সোনার টোপর, তা সে যত সস্তা
আর যত পল্কাই হোক না কেন,
মাথায় না চড়ালে

মহাজ্ঞানীও যে মানীদের ছাঁদনাতলায় বরাসন পায় না
এখনকার ভণ্ডপ্রধান ব্রহ্মাণ্ডে।
ডিগ্রীর পুচ্ছে কিছুটা উচ্চে উঠে
ঠুনকো, মেকি, অগভীর মানীজগৎটা একবার দেখে নিলাম
ভাল করে।
মিথ্যে ডিগ্রীর ভিসার ছাপ আমার জাল্ পাস্‌পোর্টে না থাকলে
জালিয়াত গণ্যমান্যদের নির্লজ্জ কাস্টম্‌স্
আমাকে আমার প্রয়াসের প্রথম এয়ারপোর্ট থেকেই
অর্ধচন্দ্র দেখিয়ে বিদায় দিত নিশ্চিত।
ওদের গড়া নরকের সড়কটা সম্পূর্ণ অপরিচিতই
থেকে যেত আমার কাছে।'

পুলিশ প্রসিকিউটর সহসা তারস্বরে চীৎকার জুড়ে দিলেন—
'সারা দেশের সুধীসমাজকে এই ইতর, ইম্‌পার্টিনেণ্ট
চিটটা অপমান করছে, ইওর অনার,
আই স্ট্রংলি অবজেক্ট টু ইট।'

কিন্তু আশ্চর্য।
এতগুলি গালাগালির গ্লানির কালি
মুখে মেখেও, আসামী শান্ত কণ্ঠেই
সরকারী আইনজীবীকে উদ্দেশ করে বলল—
'আপনি ভুল করছেন উকিলবাবু,
প্রকৃত সুধী যাঁরা তাঁরা আমারও নমস্য,
অবশ্যই আমি তাঁদের কথা বলি নি।
মূল্যহীন কতকগুলো কেতাবী ডিগ্রীর ভাপে ফুলে
রাতারাতি নিজেদের যারা ভগবান ভাবতে থাকে—

কৃত্রিমতার হ্যালো ঘেরা সেইসব শনিগ্রহের দল
ডিগ্রীহীন অথচ সত্যিকার জ্ঞানবানদের ওপর যে তাচ্ছিল্যের
নিগ্রহ চালায়,
আমার বিদ্রোহ আর বিগ্রহ কেবল তাদেরই বিরুদ্ধে।'

'ওসব বিদ্রোহ-বিগ্রহে কোর্টের আগ্রহ নেই।'
ম্যাজিস্ট্রেটের কণ্ঠ এবার মেঘগর্জনের মত শোনালো।
'তুমি যা নও তাই সাজবার চেষ্টায়
প্রতারণার সাহায্য নিয়েছ,
বিচার হবে তোমার সেই অপরাধেই।
তুমি কি অপরাধ অস্বীকার করো?'

'কখনই না।
আমার বিবেকের হাদিস-এ আমি যত বড়
বেকসুরই হই না কেন,
মানুষের আইনের থাবা আমাকে
পাপের জলজ্যান্ত লাভা বলেই যে ভাববে
সেটা জেনেও আমার অপরাধকে অস্বীকার করবো
এত বড় বুদ্ধিমান আমি নই।'

'হোয়াট্ অ্যান্ অডাসিটি!'
পি-পি তাঁর একজন্ট পাইপের ছিপি খুললেন।

তারিখ পড়লো।
আসামীর হাতে আবার কড়া চড়লো।
আদালত কক্ষবক্ষ সমবেত রসিকসুজনের কূজনে মুখর।
প্রতারককে নিয়ে প্রস্থান করলো প্রহরী।

পি-পি তাঁর জমে ওঠা কথার ঢিপি এবার উজাড় করলেন।
ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—
'ঐ ধূর্ত শয়তানটার চ্যাটাং চ্যাটাং কথাগুলো
আপনি সহ্য করলেন স্যার ?'

বিচারকের ওষ্ঠকোণ হাসির লোষ্ট্র নিক্ষেপ
করলো, মনে হ'ল।
তিনি বললেন—'প্রতারক যদি মিথ্যা কিছু বলতো
বিচারক তাহলে নিশ্চয়ই সহ্য করতো না।
সত্য বলার অধিকার আপনার মত
আসামীরও আছে এই আদালতে।'

'ও কখনও মিথ্যে বলে না, ইয়োর অনার'—
হঠাৎ এক নতুন কণ্ঠ নতুন ঝামেলার ঘন্ট পাকিয়ে বস্‌লো।
উঠে দাঁড়িয়েছে সুশ্রী সুবেশ এক যুবক আইনজীবী।
'আপনি ওকে চেনেন নাকি মিস্টার হাজরা ?'
ম্যাজিস্ট্রেট পরিচিত ব্যবহারজীবীর মুখে আসামীপ্রশস্তি শুনে
ঝুঁকে পড়লেন তার দিকে।
আসামীর কথার ঢং আর চিন্তার রং—বিচারককে বোধকরি
সকৌতুক কৌতূহলাক্রান্ত করে তুলেছিল খানিকটা,
এই ঝুঁকে-পড়াটুকু সেই রোগাক্রান্ত হবারই বাহ্যিক সিম্‌টম্‌ মনে হয়

'আমি ওর কৈশোরের সঙ্গী
যৌবনের সহপাঠী ছিলাম।
যে কোনো কথা সহজভাবে সোজাসুরে
ওর স্বীকার করার শক্তি দেখে
আমরা চিরদিনই থতমত খেয়েছি।'

'তবে আজ এ-দুর্দশা কেন ?'
পুলিশ প্রসিকিউটর অঙ্গভঙ্গীতে জঙ্গীরূপ ধরলেন,
'মুখ্যুর বেহদ্দ হয়েও, ডক্টরেট সেজে বসেছে কেন
নির্লজ্জ বেহায়াটা ?'
অ্যাড্‌ভোকেট হাজরার মুখটায় কি বেদনার একটু আভাস
দেখা গেল প্রসিকিউটরের কথায় ?
আর তাই কি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে নরম সুরে শুধালেন—
'ওর এডুকেশন্যাল কোয়ালিফিকেশন্ কতদূর
আপনি জানেন কি মিস্টার হাজরা ?'

'বেশি দূর নয়।
ডিগ্রীর জন্যে চিন্তাকুল ওকে দেখিনি কখনও।
অঙ্কের পরীক্ষার দিন সকালে ওকে বৌদ্ধগ্রন্থ ললিতবিস্তর
পড়তে দেখেছি মন দিয়ে।
আই. এস-সি'র শেষ পরীক্ষার আগের রাত্রে
ও হিব্রু সাহিত্যের ওপর প্রবন্ধ লিখেছিল ফরাসী ভাষায়
কোন্ বিদেশী পত্রিকার জন্যে।'

'বলেন কি ?
হিব্রু, ফরাসী—এ সব ভাষা জানে না কি ও ?'

হাজরার মুখখানা এবার ঝাড়লণ্ঠনে ঝলমল্
নাচ-হাসি-গানে টলমল্
সৌখীন জমিদারের বিলাসী-বজরার মত দেখালো।
প্রীতিপ্রখর স্মৃতিমুখর উজ্জ্বল দুই চোখ তুলে সে বলল,
'পৃথিবীর এগারোটি ভাষায় ওর সমান দখল, ইয়োর অনার।
এই রকম মিথ্যে ডিগ্রীর ছাপ পেছনে নেবার পর—

দেশেবিদেশে ও কম বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায় নি।
সব দেশেরই বিদ্বানমহারথীরা একবাক্যে
স্বীকার করে নিয়েছেন ওর বাগ্মীতা আর পাণ্ডিত্যের
অনন্যতাকে।
যে-সংবাদপত্র আজ ওকে 'ভদ্রবেশী প্রতারক'
ব'লে প্রচার ক'রে সবচেয়ে বেশী আত্মতুষ্টি লাভ করছে
সেই পত্রিকাতেই একদিন—
ওর দেশেবিদেশে দেওয়া বক্তৃতার
সবচেয়ে বড় প্রশংসা প্রচারিত হয়েছিল,
ভাবতেও অদ্ভুত লাগে।'

বেলা পাঁচটা বেজে গেছে।
কোর্টের আঁচটাও তাই কমে গেছে।
হাজরার শেষ কথায় ম্যাজিস্ট্রেটের মুখে
কৌতুকপ্রিয়তার দীপটাও যেন নিভে গেছে।

দীর্ঘকাল অধোবদন আর নির্বাক থাকার পরে,
হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে
বিচারক বলে উঠলেন—
'কিন্তু অমন ছেলে এমন হয়ে গেল কেন ?
এ যে বিশ্বাস করতেও প্রাণ চায় না!
ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান........'

বাইজীর হাসি

ভীষণ বেগে মটোরটা এসে থাম্‌লো
লালদীঘির পাড়ের সেই লালবাড়ীটার সেই গেটে
যেখানে একদিন
কত ফজলুল হক্‌, নাজীমুদ্দিন, প্রফুল্ল ঘোষ
নেমেছিল গাড়ি থেকে—
আর, অবচেতন মনে ভেবেছিল—
প্রাচীনা এই বাড়ি-বাইজীটা
বুড়ী হলেও জারিজুরি তো বড় কম জানে না।
তার আঁখির একটি চটুল ভঙ্গী
সারা দেশকে মুহূর্তে করে তোলে জঙ্গী।
কয়েক কোটী চোখ
সদা থাকে এই বাইজীরই সঙ্গীত আর ইঙ্গিতের
পানে সকৌতূহলে তাকিয়ে।
তবে হাজার হলেও বাইজীই তো!
একে মতি বেশি দিন থাকে না।
একই অঙ্কে বেশি দিন মাথা রাখে না।
তবু—"আমি নিজে দখলে রাখবো আমৃত্যু
এই বৃদ্ধা তবু রতিকলায় সিদ্ধা বারবালাকে,
নিঃশেষে নিঙড়ে নেবো ভোগ্য সবটুকু।"
কিন্তু হায়রে সেই অবচেতন মনের দুরাশার আস্ফালন!
সেই ফজলুল, নাজীম, প্রফুল্লের দল
শেষ পর্যন্ত নিজেরাই একদিন নিঃশেষিত হয়ে

হারিয়ে বসলো তাদের সম্ভোগ-অধিকার।
হারিয়ে গেল তারা অতৃপ্ত লালসার লজ্জিত লালা
মুখে মেখে—
অজস্রের অদৃশ্য প্রবাহে।
ওদিকে, বৃদ্ধা বাঈজী কিন্তু আজও এক নবাগতের কণ্ঠলগ্না
আর—এখন যে মটোরটা ভীষণ বেগে এসে থামল
লালদীঘির পাড়ের সেই লাল বাড়ীটার গেটে
তা থেকে যে নামলো
সে আর কেউ নয়, সেই নবাগতই।
বাইজীকে আমরণ ভোগ করার
লিপ্সার লালা তারও অবচেতন মনের ঠোঁটে চিক্‌চিক্ করছে।

রাজনীতির মদিরামত্তা রতিবিহ্বলা লাল বাইজীটা
শীতের কুহেলি মাখা ঢুলু ঢুলু দৃষ্টিতে—
কূটচক্রে বক্র হওয়া ওষ্ঠযুগল আরও একটু বেঁকিয়ে
হঠাৎ হাসলো যেন একবার, মনে হল।

অতীতের অনেকের লুব্ধ-লিপ্সার ক্ষুব্ধ এপিটাফ
মূর্ত হল সেই ধূর্ত হাসির গুপ্ত রেটিনায়।

ধনী-মানী-জ্ঞানীর যেন না হই কোনোটাই !

১

রাজপুতানার সবচেয়ে বড় রাজ্যের সে রাজা—
বৈভবে আর বিত্তে বিপুল নাম,
সুঠাম সবল অঙ্গ তাহার নতুন রঙ্গে সাজা,
ইঙ্গিতে তার পূর্ণ মনস্কাম।
নিত্য নব সম্ভোগেতে প্রমত্ত তার দিন
ভৈরবীতে শুরু হয়ে বেহাগে হয় লীন।
নিটোল-তনু কিশোরী দুই তিন—
রাজার সেবা করে অবিরাম।

—সেই রাজারে সেদিন সাঁঝে হঠাৎ পেয়ে একা
বলি ডেকে, 'বন্ধু, যখন পেলেম তোমার দেখা
একটি কথা শুধাই সঙ্গোপনে—
সম্ভোগেতে সুখ পেয়েছ মনে ?'
উত্তরেতে করুণ হাসি হেসে
বল্‌লে ধনীর সেরা রাজা—'ভাই,
অনেক পেলেম, তবু যেন আরও অনেক চাই !'

২

শস্য-শ্যামল মস্ত দেশের মন্ত্রী সে নামজাদা,
দয়াল তবু শ্রেষ্ঠ বীর্য্যবান।
বিদেশে তার খ্যাতির চেয়েও বড় যে মর্য্যাদা,
অতুল তাহার ক্ষমতা-সম্মান।

পণ্ডিত সে, মহাজ্ঞানী, বিশ্ব সভার মাঝে
বুদ্ধি তাহার হচ্ছে সহায় অসংখ্য সৎকাজে ;
কণ্ঠেতে তার যে-সুরখানি বাজে—
মুগ্ধ তাতে বিশ্ববাসীর প্রাণ।

—সে-মন্ত্রীরে খেয়ালবশে জানাই লিপি লিখে,
'বন্ধু, আমার বাঞ্ছা মনের নেবোই এবার শিখে
তোমার কাছে সুখের পন্থাখানি,
সুখের তোমার অন্ত তো নেই, মানী!'
উত্তরেতে মন্ত্রী জানায় ব্যথা—
জানায় দেশের মানীর সেরা, 'ভাই,
ক্ষমতা আর মর্য্যাদাতে সুখ তো কিছুই নাই!'

৩

মহর্ষি এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সে ধ্যানী
হিমাচলে তাহার অধিষ্ঠান,
দর্শনে আর সর্বশাস্ত্রে অতুল্য প্রজ্ঞানী
সর্বময়েই সঁপেছে তার প্রাণ।
করছে কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন দ্বাদশ বছর ধরি'
মুক্ত দেহে থাকে শীতে অর্ধ-আহার করি'।
কামনাহীন তাহার জীবনতরী
পায় না কভু অসংযমের টান।

—সে-সন্ন্যাসীর পেলেম দেখা বদ্রীনাথের পথে!
বলি ডেকে, 'বন্ধু, আমার পুরাও মনোরথে!
সুখের পথটি তোমার আছে জানা
দাও না আমায় সে-পথের নিশানা!'

উত্তরেতে সরল হাসি হেসে
বললে জ্ঞানীর সেরা ঋষি—'ভাই,
সুখ ছেড়েছি শান্তি যাতে পাই ;
পাওয়া কি যায় সহজে যা চাই ?'

আজকে বসি বিজন নদীর তীরে—
তোমার পায়ে এই নিবেদন তাই
ধনী-মানী-জ্ঞানীর যেন না হই কোনোটাই।
যে ধন-মান আর জ্ঞানেতে নেই শান্তিসুখের সাড়া,
তাদের তরে না হই যেন কভু চেতনহারা।

শান্তি থাকে সুপ্ত হৃদয় কোণে—
তারে যে পায়, সুখের নেশায় ঘোরে না সেই জনে
ধনী-জ্ঞানী-মানীর আবরণে
সাজলে শুধুই যায় না খোলা সুখের মণিকোঠা
শান্তি সেথায় ঘুমায় সঙ্গোপনে।

এ তোর ভ্রান্তি

রুশ, আমেরিকা, বৃটিশ, জাপান
ওদের দুয়ারে ভিক্ষা চাস্ ?
গড়াগড়ি খাস্
ফ্যাক্‌ট্রি, মিল্ আর ঝুটা ব্যাপারীর পদরজে ?

অমিতবিত্ত অমৃতপুত্র
ভ্রান্ত ভারত, চা দেখি চোখ !
খুলে ছিঁড়ে ফেল্ বিদেশী কেতায়
ফিট্‌ফাট্ সাজা ও-নির্মোক।

'ধন্ ধন্' করে প্রাণমন ঢেলে খুঁজিস্ কি ?
তোর বুক ভরা অরূপ রতন বুঝিস্ নি ?

ওদের শেখানো বুলিতে ঝুলিটা ভরেছিস্।
ওদেরই ঢং-এতে বিলাসের পুজো করেছিস।
ভেবেছিস্—যার অর্থ নেই,
হেয়, নগণ্য, তুচ্ছ সেই ?
টেলিভিশন আর স্কাই-স্ক্রেপার,
মোটেল, নাইট্ ক্লাব আর 'বার',—
সভ্য মানুষ তাকে তো বলে না
সামান্য এও না আছে যার ?
এ তোর ভ্রান্তি, এ তোর পাপ।
এর বড় কিছু নেই অভিশাপ।

নিজে ছোট ভেবে, তোর চেয়ে হীন।
ওদের স্বর্গে তুলেছিস,
ওরা পাশবিক-বৃত্তি-পূজারী—
তুই মানুষ, তা ভুলেছিস্।

আয় দেখি তোরা এগিয়ে আজ।
হিংসা, দম্ভ, কামুকতা আর কোপনতা-ইঁটে গড়ে তোলা
ওদের অযুত ইমারতে আছে
তোদেরই খুনের পলেস্তার,
ঐ ইমারতে হান্ তো বাজ।

বিশ্ব দেখুক নিঃস্ব দেশের দধীচিশিষ্য মানুষ সব—
নিজের অস্থি জ্বালিয়ে স্বস্তি আন্‌তে ধরেছে কী তাণ্ডব।

বিদ্রোহী

তোমাদের গড়া অবতার-কথা
জানি না, বন্ধু, জানি না।
কৃষ্ণ, রাম, কি ধ্রুব, প্রহ্লাদ
কাউকে এ-মনে মানি না।
জানি না হরিশ্চন্দ্র কে ছিল
কে ছিল নল কি বুদ্ধ,
কোন্ সে চণ্ড হ'ল ধার্মিক
করে' কলিঙ্গ-যুদ্ধ।

যত রাজা রাজপুত্র কাহিনী
ধর্মের নামে গেঁথেছো,
শাস্ত্র-গ্রন্থ-বুক ভরে শুধু
তাদেরই আসন পেতেছো।

কোন্ সে-রাজার উপদেশ ঠাসা আছে
কোথা কোন্ কেতাবে—
কী নাম তার তা জানি না—
চাই না চিন্‌তে গীতাকে,
চিনি না শৈব্যা, দময়ন্তী কি
সতী-সাবিত্রী-সীতাকে।
শুনে শুনে পচে গেছে কান
তোমাদের ঐ রাজরানী-রাজনন্দিনীদের গুণগান।

আমি জানি অখ্যাত অজ্ঞাত দরিদ্র এক কর্ণকে
পাটকলে খেটে রাত্রিদিন
সপ্তাহ শেষে আয় হয় যার কুড়ি টাকা।
ঘরে আছে বউ, ছেলে আর মেয়ে—
আর আছে অতি বৃদ্ধা মা।
তবুও যখনই কেউ পাতে হাত কোনো প্রয়োজনে তার কাছে
তখনই সে দেয় যা আছে তার—
ভাবে না নিজের ছেলে-মা-বৌ-এর কী হবে কাল।

একবার সারা হপ্তার টাকা দিয়ে দিল এক মজুরকে
যার বউ নাকি মরো মরো,
সেবার ঘরের কী দুরবস্থা হতদরিদ্র সে-কর্ণের।
শুধু জল খেয়ে তবু হাসিমুখে
কাটিয়ে দিয়েছে সাতটি দিন।

আমি গাই গান
স্বচক্ষে দেখা সেই সীতার—
রাজদুলালী কি রাজমহিষী যে নয় কোনো।
গোয়াবাগানের বস্তীতে—
ফুটো চালাঘরে ছিন্ন-বস্ত্রে জীবন যার
শত কামুকের শ্যেন্-দৃষ্টির সম্মুখে—
নির্মল আছে নির্মাল্যের মতন ঠিক।
বাপ দ্বারে দ্বারে কীর্তন গায়।
সকাল-সন্ধ্যা ভিক্ষে পায়।
তাতে কোনোমতে দিন চালায়।

স্বামী—বিবাহের দুবছর পরে জাহাজের কাজে গেছে বিদেশ,
পাঁচ বছরেও ফিরে সে আসে নি।
কোনো পত্রও পায় নি তার,
তবু, সিঁথিটিতে সোহাগ-সিঁদুর আজও মাখে—
আজও গৌরবে শাঁখা-নোয়া পরে
গোয়াবাগানের সেই সীতা।

রাবণ রাজার দল ঘোরে ফেরে চারি দিকে।
কপর্দকহীন বাপকে দেখায় টাকার লোভ।
ভ্রষ্টা অন্য মেয়েকে পাঠায় দূতী করে—
সীতার কানেতে তুলে দেয় প্রলোভনে ভরা
বাড়ী-গাড়ী আর গয়নাদানের শপথটা।
নিজের চোখেতে দেখেছি, বন্ধু—
বস্তীবাসিনী সেই সীতার
দুই চোখে জলে দপ্ দপ্ করে পবিত্রতার হোমাগ্নি।
সেই আগুনেই পুড়ে হয় ছাই
রাবণের শত কুপ্রস্তাব।

এই তো, এবার দেওয়ালীর দিনে—
তখন রাত্রি নটা হবে,
মদ খেয়ে এলো অয়েল মিলের মালিক এক—
সশস্ত্র দলও ছিল সাথে।
মাত্র একুশ বছরের সীতা,
যার নিজ নাম বিনোদিনী—
শ্বেত পদ্মের মতন শুভ্র দেহের রং,
জানু ছোঁয়া কেশ, ভ্রমর-কৃষ্ণ আঁখি দুটি।

যৌবন জলতরঙ্গ দেহে দিকে দিকে।
সেই সীতাকেই সবলে সদলে নিয়ে যেতে
'এলো রাবণরাজ।
প্রলোভনে বশ মানে না যে মেয়ে—
থেঁৎলিয়ে তাকে করবে শেষ।

অয়েল মিলের রাবণরাজার দাপট তো কারো অজানা নয়।
লাখ লাখ টাকা, খান দশ বাড়ী।
গোটা বাহান্ন ট্রাক আর কার।
তারই আগমনে বস্তীবাসীরা ভয়ে জড়োসড়ো ভেবে সারা।

ফুটো চালা-ঘরে ছিল বাপমেয়ে
মাতা গিয়েছিল কালীতলা।
লাথির আঘাতে জীর্ণ দরজা আর্ত-শব্দে ভেঙে পড়ে।
আর্তকণ্ঠে 'বাঁচাও বাঁচাও'—বাপ কাঁদে।
কিন্তু কন্যা পাথর প্রতিমা
হুতাশন-শিখা দুই চোখে।
উত্তেজনায় ফোঁস ফোঁস করে পড়ছে শ্বাস।
আঁশ-বঁটিখানা দুই হাতে তুলে চণ্ডীর রূপে দাঁড়িয়ে সে।
মাতাল রাবণ চম্‌কে চায়।
ছিট্‌কে পিছায় গুণ্ডাদল।
আধপেটা খাওয়া 'ছিন্নবসনা'—তারও দৃষ্টিতে বহ্নিতেজ
প্রচণ্ডা পাপমর্দিনীরূপা এ নারী কে?

শান্তনুসুত ভীষ্ম কে ছিল
জানি না, বন্ধু, জানি না।
রাজকুমারের শপথ-বিলাস

অতুল্য বলে মানি না।
আমার জানা যে ভীষ্ম, সে
নিজ প্রতিভায় বিশ্বকে
বিস্মিত বিভ্রান্ত করেছে যৌবনে।
নাম যে শোনাবো—উপায় নেই।
মহাভারতের জয়ঢাক-পেটা বিজ্ঞাপন
অন্তরে সে যে করে ঘৃণা।
তবু, শুনে রাখো আমার ভীষ্ম-কাহিনীটা।

সবল সুঠাম, সুরূপ পুরুষ
প্রত্যয়ভরা দৃষ্টি তার।
নিম্নমধ্যবিত্তে জন্মে যৌবনেই সে লব্ধমান।
মাসান্তে আয় দেড় হাজার।
কাগজে কাগজে তার খ্যাতি।
দেশের শ্রেষ্ঠ কুবের, শ্রেষ্ঠী, ধনাঢ্য কুলপতির দল
লক্ষ টাকার যৌতুক
আর নিজ রূপবতী কন্যাকে
ধরেছেন তুলে সামনে তার।
তবু, ভীষ্মের সংযম দ্বার
বন্ধই থেকে গেছে আজও,
আজও সে রয়েছে অকৃতদার
আজও শয্যায় শোয় একাই।

বৃদ্ধ পিতার দু'চোখ অন্ধ—
বোনটির আছে মাথার রোগ,
পাছে পরিণীতা ধনীর দুহিতা
ওদের করে তুচ্ছ জ্ঞান,

অপমান করে পদে পদে,
পাছে ঐ নিয়ে অশান্তি হয়
পায় ব্যথা পিতা অথবা বোন—
শুধু সেই ভেবে আমার ভীষ্ম
করে নি জীবনে নারী গ্রহণ।
আজ সে বৃদ্ধ, অতি প্রসিদ্ধ—
তবুও আজও সে ভাঙে নি পণ।

রাজার দুলালী সাবিত্রী কথা তোমরা রচেছো কাব্যতে—
আমার কাছে তা কল্পনা।
যমের পেছনে যমপুরী ধাওয়া
নিছকাজগুবি জল্পনা।

রাজকন্যার গাইতে জয়
তোমরা নিয়েছ অবাস্তবের উৎকট উদ্ভটাশ্রয়।

কিন্তু আমার সাবিত্রী যিনি
তাঁর কথা যদি শোনো,
বিশ্বাস করে আশ্বাস পাবে
অবিশ্বাসীর মনও।

প্রাথমিক স্কুলে নগণ্য শিক্ষিকা—
মাসিক মাইনে নগণ্য তারও চেয়ে।
দুপুরে পড়ান বিদ্যালয়েতে—
সন্ধ্যা সকালে টুইশানি আছে দুটি।
নেই কোন সন্তান।
স্বামী বলে যাঁকে মেনে নিয়েছেন মনে—
যৌবনে একদিন
সেই যুবকেরই প্রেমের ব্যাকুল বানে

কুমারী হৃদয় ভরে উঠেছিল তাঁর
ফাগুন দিনের কুহুর কুহক গানে।
কিন্তু, বিয়ের পরে বেচারীর দুমাসও হয় নি গত
দারুণ কুষ্ঠ ধরেছে স্বামীকে তাঁর—
সে আজ দীর্ঘ এগারো বছর হবে।

এক একটি করে খসেছে আঙুল সব।
চেপে বসে গেছে নাক,
বিবর্ণ দুটি কান বিকৃত বিশ্রীরকম ফোলা,
দুটি গাল ঝোলা ঝোলা।
ঘোলাটে দু চোখ, সারা দেহ ফাটা ফাটা,
দুর্গন্ধেতে ঘেন্নায় দেয় কাঁটা।

ডাক্তার আশা ছেড়েছে অনেক দিন।
একটি ঝি ছিল—
আতঙ্কে সেও গিয়েছে এ-গৃহ ছেড়ে,
ইদানীং যেন গলিত কুষ্ঠ রোগ
স্বামীর গিয়েছে হঠাৎ ভীষণ বেড়ে।

তবু সেই শিক্ষিকা-সাবিত্রী হাসিমুখে বসে একা
স্বামীর শিয়রে দু হাতে করেন সেবা।
সংক্রমণের ভয়ে শিহরিত হয় না কখনও মন,
দুধ দিয়ে ধোন পচে গলে যাওয়া ঘা,
সযত্নে ব্যাণ্ডেজে বেঁধে দেন পা।

ভাত মেখে তাই খাওয়ান নিজের হাতে,
পায়খানা যাবে—তখনও থাকেন সাথে।

রাত্রে কুষ্ঠরোগী সে-স্বামীর বাম পাশে শোন নিজে
সাদরে বুলায়ে প্রেমার্দ্র কর দেহে,
দেন আশ্বাস, শোনান অভয়বাণী—
স্মিতমুখে কন পতিদেবতার কানে,
'তোমার পাশেতে শুতে পেলে, জানো ওগো,

মনে মনে মানি আমিই তো রাজরানী—
আর কোনো ক্ষোভ ব্যথা থাকে না'কো প্রাণে।"

জানি নে আমার এই সাবিত্রী এগারো বছর ধরে
প্রতি পলে পলে যমের সঙ্গে লড়ে
শেষ অবধি তাঁর সত্যবানের প্রাণ
ফেরত পাবেন কি না।
তবু, স্বামীভাবে পেয়েছেন যাকে মাত্র দুইটি মাস
শুভ বিবাহের পরে,
তাকেই বাঁচাতে এই যে জীবন পণ—
গলিতকুষ্ঠ দুই হাত দিয়ে ঘাঁটা,
দেবতার পূজা করে চলেছেন যেন
একদিন নয়, নয় এক মাস—
দীর্ঘ এগারো বছর কেটেছে যমের সঙ্গে যুঝে।
তবু তাঁর দুই চোখ
হারায় নি আজও সতীহৃদয়ের উজ্জ্বল প্রেমালোক।

এমনই ভীষ্ম, কর্ণ, সীতা ও সাবিত্রী কথা নিয়ে
আমি রচি জয়গান।
আমার প্রাণের পূজার বেদীতে এদেরই সাদরে বসায়ে
করি যে অর্ঘ্যদান।
আর, তোমাদের গ্রন্থের গড়া অবতারদের চিনি না ভাই
জানি না রাজা শ্রীকৃষ্ণ কি রাম—অথবা বুদ্ধ-উপাখ্যান
জানতে চাই না রাজার দুহিতা
সাবিত্রী-সতী-সীতার দাম?

আমার হৃদয়ে অবতার এরা—
এই সাধারণ অতি দরিদ্র তবু পবিত্র অভাগা দল।
আমি গাই শুধু এদেরই গান।
এরাই আমার প্রাণের দেবতা—
এরাই আমার শ্রীভগবান।

পসারিণী

'নাম চাই নাম'—হাঁকে কাল-পসারিণী,
'সস্তা সুনামে ভরা মোর ঝুড়িখানা।
যে চাও সে নাও ঠিক দাম দিয়ে কিনি—'
পসারিণী হাঁকে একসুরে একটানা।

সত্যযুগের রাজপথে থামে নারী।
আয়ত-নয়নে বলে মৃদু হেসে হেসে—
'কে কিন্‌বে নাম, এসো না গো তাড়াতাড়ি,
দাম দিয়ে নাম লুটে নাও নিঃশেষে।'

পথের দুধারে যুগবাসিন্দা যত
শুধায়—'নামের কি দাম বলো তো মেয়ে?'
'শ্রম আর সাধনা—' বলে নারী লাজনত,
'যা চেয়েছ দাম দেবো বেশি তার চেয়ে।'
সোৎসাহে কয় শত শত পথচারী।

এরপরে আসে ত্রেতাদ্বাপরের পথে—।
সত্যযুগের চেয়ে এই পথ ছোটো।
হাঁকে পসারিণী সুর তুলে কণ্ঠতে—
'এসো এসো সব, দাম দিয়ে নাম লোটো।'

'কী দামে বেচ্‌ছো নাম বলো দেখি শুনি?'
জিজ্ঞাসা করে সাগ্রহে জনাকয়—
'শ্রম আর সাধনা কড়ি দাও গুণি গুণি,
বিনিময়ে নাম পাবে জেনো নিশ্চয়।'

কুঞ্চিত হ'ল ত্রেতা দ্বাপরের চোখ—
'শ্রম আর সাধনা—নামের এতই দাম?
ঠকাচ্ছো না তো পেয়ে বোকাসোকা লোক?
বেশি হ'ল, তবু, যা চেয়েছ তা দিলাম।'

'নাম চাই নাম—' হাঁকে কাল-পসারিণী,
যুবতী সে নারী হাঁকে কলি-বাইলেনে,

এ পথে দুধারে নোংরার ছিনিমিনি—
ঘৃণ্য গন্ধ-ভরা জঘন্য ড্রেনে।
'কী দাম নামের?' শুধায় রুক্ষ স্বরে
কুটিল চক্ষে কলি-বাইলেনবাসী,
'নাম পাওয়া যায় বিনা ক্লেশে ঝট্ করে?'
বিস্মিত চোখ, ঠোঁটে বিব্রত হাসি,
বল্‌লে যুবতী—'শ্রম আর সাধনা শুধু
দেবে গো আমায় নামের মূল্য ধরে,
ওদুটি না হলে জীবন যে করে ধুধু,
নাম তো মেলে না মুহূর্তে মন্তরে!'
শুনে হেসে ওঠে যত কলিযুগচারী।
'শ্রম আর সাধনা মূল্য কে দেয় কবে
নামের জন্যে? হায় অভাগিনী নারী,
এ যুগে নামের ও দাম কি কারও সবে?
ছাড়ি যদি শুধু তপ্ত দুচার বুলি
স্বর্ণ সুযোগে রক্তনাচানো সুরে—
যশের দুয়ার নিজ হাতে যাবে খুলি
অক্ষয় ঠাঁই পাবো কৃতিত্বপুরে।
মূর্খ পসারি-সুন্দরি তুমি নিজে—
পুরনো নীতিতে বিশ্বাসী আজও, তাই
নামের মূল্য কি বল্‌তে বলো কি যে,
শ্রম আর সাধনা—শুনে হেসে মরে যাই।'
স্তম্ভিতা নারী, আশাহত বিহ্বল—
তবু, বলে, 'জেনো ফাঁকিতে যে নাম পেলে
ফাঁকা সে নামের নেই কোনো সম্বল—
কেউ যে হৃদয় দেবে না সে-নামে ঢেলে।'
'নাম চাই নাম—' হাঁকে কাল-পসারিণী,
কালের পসরা বেচে যুগে যুগে ফিরে,
শ্রান্তচরণে চলেছে নিতম্বিনী,
অশ্রুবাদল নেমেছে দুচোখ ঘিরে।

কর্তব্য

সবহারাদের পাড়া।
এ-পাড়া সব পাড়া ছাড়া।
যে সব হারায় নি
এ পাড়ায় সে দাঁড়ায় নি।
সব মানে—সতীত্ব,
একচারীত্ব।
সৌখীনেরা সখ করে বলে—নটীপাড়া,
বাদ্‌শা আলম্‌গীর এ পাড়ারই নাম দিয়েছিলেন—শয়তানপুরা।
তা সে পুরাই বলো আর পাড়াই বলো,
নটীই বলো আর শয়তানই বলো—
সব কয়টার যোগফল কিন্তু ঐ একই,
এটা সবহারাদের পাড়া—
এ-পাড়া সব পাড়া ছাড়া।

এ পাড়ারই কোনো এক অংশে
সেদিন মাঘের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।
ময়লা পল্লীর কয়লা-চুল্লীর সংখ্যা তো বড় কম নয়।
হিম আর ধোঁয়ার দ্বৈত-মূর্ছনায় সন্ধ্যার চোখ মূর্ছাহত।
জীবন্ত-নারীমেধ যজ্ঞের জ্বলন্ত আগুন টল্‌টল্‌ করছে
সুগোল-ভুঁড়ি শুঁড়ীর বোতলে।
আর পথের দুই ধারে ঝল্‌মল্‌ করছে
লজ্জাহীন সজ্জায় সজ্জিতা যজ্ঞের বলিগুলি।
বলিদানের বাজনা বাজছে চাট্‌-এর দোকানের অ্যামপ্লিফায়ারে।
বস্তা ভরা সস্তা দরের রতি-আরতির গান।

একটি বাড়ির চারপাশে কিন্তু কেবল ফিস্‌ফাস হুসহাস্‌।
বামুনদের বাড়ির মেয়েটাকে গঙ্গার ঘাটের পাশ থেকে
তুলে নিয়ে এসেছে পাড়ার ছোঁড়াগুলো
বাড়িউলির হুকুমে।
পর পর চারদিন তক্কে তক্কে থাকার পর
আজই প্রথম স্নানের ঘাটের অদূরের
মালগাড়ি চলাচলের লাইনের পাশে
পেয়েছিল ঐ ষোড়শী ফুটফুটে মেয়েটাকে একা।

স্নান সেরে ভিজে চুলে পিঠ ভরিয়ে
ঘাট থেকে উঠে বাড়ির পথে—
যখন লাইনটার কাছাকাছি এসেছে বেচারী, তখনই
হুস করে ওর সামনে গাড়িটা এনে
এক হেঁচকায় তুলে নিয়েছে ওকে গাড়ির মধ্যে,
আর, তারপরেই সিধে এই তে-মাথার বাড়ির
স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার ঘরটায় এনে করেছে বন্দী।
পাঁচ ছোঁড়াকে পাঁচটা একনম্বরি বোতল খাইয়েছে বাড়িউলি,
বোতল খাওয়ালেই ওরা কোতল করতে রাজী যে কাউকে—
হিসেবী বাড়িউলির সেটা অজানা নয়।
তার ওপর আবার ওদের শুনিয়েছে টঙ্কার ঝঙ্কার।
সফল হলেই সুফল পাবি,
ছুঁড়িকে আনতে পারলেই
চাঁদির চাকায় ভরবে ঝাঁকা—
ভাবনা কি?

হুকুমটা অবশ্য বাড়িউলির নিজস্ব নয়।
ওকে আবার হুকুম করেছে পাটকলের

গাঁটভারী এক মালিক—বুড়োশালিক
যার ঘাড়ে উঠেছে রোঁ—
যে রুপোর ছটায় অঘটন ঘটায়,
যে পাড়ায় পাড়ায় মেরে বেড়ায় কাঁচা মেয়েদের ছোঁ।
আগাম টাকার সালাম পেয়েছে বাড়িউলি
লাগাম ধরেছে সেই জন্যেই তো সে শক্ত হাতে।

প্রথমে একাই ঢুকেছিল ঘরে বাড়িউলি
শেঠ-এর দেওয়া চোদ্দ ক্যারাটের গয়নাগুলো হাতে নিয়ে।
সঙ্গে একটা নকল নাইলনের শাড়ি নিতেও অবশ্য ভোলে নি।
তার ওপর ছিল খুস্‌বু তেল, আল্‌তা, স্নো।
উঠতি মেয়ের সতীত্বের দেমাকের দমক্‌কে চমক
লাগাতে এগুলি জমকদার দাওয়া আর কি!
কিন্তু মিনতি নির্বোধ অতি।
সেই যে দু চোখে হাত চেপে বসে ছিল, তেমনই রইল।
বোকা মেয়ে চোখের জলকেই বোধহয় স্নো ভেবেছে,
বসে আছে তাই সারা মুখে সেই জল মেখে।

বাড়িউলি তো হাঁ।
মেয়ে-ময়না বশ হয় না গয়নায়!
কত দেখে এসেছি অমন বামনাবিটির দেমাক্‌।
আচ্ছা, রোসো,
অন্য রসে আসো কি না বশে, একবার দেখাই যাক্‌।

অতএব ধরতেই হল অন্য রাস্তা।
পাড়ার সবচেয়ে ওঁছা গুণ্ডাটাকেই ডাকতে হ'ল

নতুন ঘোড়ার সোজা ঘাড়কে বাঁকা করতে।
জবরদস্তি ছুঁড়ির গলায় কিছু ঢালতে পারলেই
স্বস্তিতে শ্বাস ফেলতে পারে বুড়ী।
নেশায় রাঙলে দেমাক ভাঙতে কতক্ষণ ?
তখন আর আপত্তি তুলে বিপত্তি ঘটাবে না
বামনাবিটি।
এ-ফরমুলায় ফেলে এর আগেও
কম অঙ্ক তো কষে নি বাড়িউলি।

কিন্তু চলো গো ভাই গল্পশ্রোতার দল,
সেই মারাত্মক গুণ্ডা নিতাই এক হাতে ছোরা
অন্য হাতে বোতল নিয়ে অভাগিনী মিনতির ঘরে
ঢোকার আগে, চলো, চট্ করে একবার
থানাঘরে হানা দিয়ে আসি আমরা,
সেখানে অত উত্তেজিত ভাবে
কে ঢুকেছে ঐ যোয়ান ছেলেটা বলো তো ?

ছিপছিপে গড়ন, চক্‌চকে চোখ,
উন্নত নাক, এ কেমন লোক
পুলিসকে দেখেও যে ডরায় না ?
দারোগাকে পীরের দরগা ভেবে
তার সামনে ভক্তিতে যে লোক গড়ায় না ?

সোজা ঢুকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সোজা বললে সব কথা
শেষে অনুরোধ করলে—
'যদি বাঁচাতে চান তো এক্ষুণি চলুন।'

অধীরবাবু কিন্তু এমন মারাত্মক সংবাদেও
এতটুকুও অধীর হলেন না।
তিনি পুলিসী ক্যাল্‌কুলাসে মন দিলেন।
ঠিক এই অবস্থায় গিয়ে পড়লে
বাড়িউলি নিশ্চয়ই হাতে নগদ কিছু দিয়ে আপ্যায়ন করবে,
চাই কি ষোল বছরের টাট্‌কা মেয়েটাকে নিয়ে
ফাট্‌কা খেলাতে তাঁকেও একজন শেয়ার-হোল্ডার
বানিয়ে দিতে পারে বাড়িউলি।
আর না দিলে, তিনিই বা ছাড়বেন কেন ?
শেয়ারমার্কেট ফেল মারিয়ে ছাড়বেন না কালই।

'কী হ'ল, চলুন তাড়াতাড়ি।'
আগন্তুক যুবকের ত্রস্তকণ্ঠ ব্যস্ততা ব্যক্ত করলো।
অধীরবাবু সুধীর স্বরে বললেন—
'দেখুন মশায়, এসব ব্যাপারে অতি বাড়াবাড়ি ভাল নয়।
এসব জায়গায় রেইড করতে হলে
পেছনে এইডের দরকার, প্রস্তুতির প্রয়োজন।
আপনি যান, আমি যাবো ঠিক সময়ে।
আপনার কর্তব্য আপনি করেছেন—
পুলিসের কর্তব্য পুলিস করবেই।'
গৌতমবুদ্ধের ঢং-এ দৃষ্টি মেলে,
সক্রেতিসি রং-এ কণ্ঠস্বর রাঙিয়ে
বিনয়বচনের পুলিসী পাঁচন পরিবেশন করলেন
এস. আই. অধীর সোম।

ওদিকে পৌঁছে গেছে ততক্ষণে ডাকসাইটে গুণ্ডা নিতাই।
চোলাই খেয়ে ঘোলাই হওয়া দুই রুদ্রাক্ষ তার

নারীমেধ যজ্ঞের পৌরোহিত্যের যোগ্যতার সাক্ষ্য
বহন করছে।
ছোরাটা অবশ্য হাতে নেয় নি।
ওটা গোঁজা রয়েছে কোমরের বেল্টের নীচে আধখানা।
সোজা হয়ে দাঁড়াবে বেশিক্ষণ—
ততটা ক্ষমতা বা সমতা নেই তার পায়ের।
তবু, ঘরে ঢুকেই, রোরুদ্যমানা মিনতির
শাড়ি ধরে টানাটানি করতে দেরি করে নি তার হাত।
বাইরের দাওয়ায় বাড়িউলি স্বয়ং প্রহরায়।

সন্ধ্যার পর বুড়োশালিক সেই মিল-মালিক আসবে,
তার আগেই ছুঁড়ির কুমারীত্বের দেমাকের মুখে
নুড়ি না ঘষতে পারলে
বুড়োশালিকের সাধ্যি কি ঐ মেয়েকে বশে আনে!
আর সে না খুশী হলে ইনামের খড়ভুষি
কি জুটবে বাড়িউলির কপালে?
তাই নিতাই-ই এখন হাতেম-তাই তার কাছে,
তার একমাত্র ভরসা।

বুকের কাপড় আঁকড়ে ধরে
আর্তচিৎকারে যখন মিনতি সচকিত করে তুলেছে
আশপাশ, সেই সময়েই অধীরবাবুর আবির্ভাব রঙ্গস্থলে।
তাঁকে দেখেই বাড়িউলি নিজের ত্রাসে ফ্যাকাশে
মুখখানায় ঠান্‌দিমার্কা হাসি ফুটিয়ে
সাদর অভ্যর্থনা জানালো—'আরে কী ভাগ্যি আমার!
এসে গেছেন আপনি?

আমি তো ভাবছিলাম এখনই লোক পাঠাবো
আপনাকে ডাকতে।
এমন ভাল জিনিস ঘরে তুলেছি—
আপনি তাকে প্রসাদ করে না দিলে
আমার মনে আনন্দ আসবে কোথা থেকে, দারোগাবাবু ?
আসুন, এই চেয়ারটায় একটু বসুন গো,
নেতাই বেরুলেই আপনার ঢোকার ব্যবস্থা
আমি করে দেবো।'

সবহারাদের পাড়ায়
আজ আবার কার সব হারাবার পালা ?
বন্ধঘরে বন্দী মিনতির আকুল আর্তনাদ,
বাইরে বারান্দার ওপরে বসা দেশ আর সমাজের শান্তিরক্ষক-
ভক্ষক এক তক্ষকের রূপে আজ।

ঠিক এই সময়ে ঘটে গেল অঘটন।
মাঘের শৈত্যশীর্ণ সন্ধ্যার সুপ্তি সহসা বিদীর্ণ করে
সদরে একটা মটোরের হর্ন।
তারপরেই, ঝড়ের ঝাপ্‌টায় তিন মূর্তি ঠিক্‌রে এসে
পড়লো চেয়ারে বসা দারোগার সামনে।
অধীরবাবু উঠে দাঁড়াবার আগেই তাঁর টুঁটি টিপে
ধরে চিৎকার করে উঠল একজন—
'পুলিসের কর্তব্য বুঝি এমনি ভাবেই
সমাধা করো তুমি দারোগা ?'
চিঁ চিঁ করে অধীর বললেন—'একি, আপনি ?
মানে থানাতে আপনিই তো—'
'হ্যাঁ, আমিই।

একটু আগে আমিই গিয়েছিলাম নালিশ
নিয়ে তোমার কাছে, আর তুমি শুনিয়েছিলে
কর্তব্যের লেক্‌চার। তোমার কর্তব্য তুমি করেছো,
এবার আমার কর্তব্য দ্যাখো।'

ইতিমধ্যে, অপর দুইজন বদ্ধ ঘরের
জীর্ণ দরজা তিন লাথিতে ভেঙে—
দুই প্রচণ্ড আপারকাটে
নিতাইকে প্রথমেই পাঠালো সরষেফুলের মাঠে।
বেচারী এমনিতেই টল্‌টলে হয়েছিল।
তড়িৎ-ঘুঁষিতে সিঁটকে হরিৎ হয়ে
ছিটকে পড়লো সে সাত হাত দূরে।

অর্ধনগ্না ব্রাহ্মণকন্যা ডুকরে কেঁদে উঠল
নিদারুণ লজ্জায় আর শঙ্কায়।
এরপর আরও কত বাকি লাঞ্ছনার ?

কিন্তু যুবক তো নয়, যেন যন্ত্র।
সান্ত্বনার বাণী নেই তাদের মুখে,
স্তোকবাক্য নেই জানা।
বিনাবাক্যব্যয়ে মিনতির হাত ধরে
টেনে নিয়ে এলো তারা দলপতির সামনে।
দলপতি তখনও কিন্তু টুঁটি ছাড়ে নি অধীরের।
মিনতি যে বিষাক্ত দংশনে বিষাক্ত হবার
আগেই রক্ষা পেয়েছে, এটুকু বুঝতে পেরে
তার মুখখানা সাফল্যের স্বর্গীয় আনন্দে
মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।
কিন্তু, তার পরমুহূর্তেই অতি ভয়ঙ্কর।
তার হাতের ইস্পাতী পেষণে
অধীরের নেত্রেও সর্ষপক্ষেত্রের ছায়া।
চিৎকার করে বললে দলপতি—
'তোমার মত স্বার্থসর্বস্বরা যতদিন এমনিভাবে

কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে চলবে, অধীরবাবু,
এই পৃথ্বীশ মজুমদারকেও ঠিক ততদিনই
এমনিভাবে করে যেতে হবে কর্তব্যকর্ম তারও।
দেশে একশোটা পৃথ্বীশ যেদিন
একযোগে রুখে দাঁড়াবে তোমাদের আত্মঘাতী
এই জয়যাত্রার সামনে,
কোথায় ভেসে যাবে সেদিন তোমাদের
শরাব আর সাকীতে ডুবে থাকা
আজকের এই কর্তব্যের কফিন্।'
বলেই, মিনতিকে নিয়ে ঝটিকাগতি তিন মূর্তি
পরক্ষণেই মটোরে উঠে অদৃশ্য।

অধীরবাবু সেই যে এলিয়ে পড়েছিলেন,
সেই রকমই রইলেন।
দলপতির নাম শুনে আতঙ্কের আতিশয্যে
অজস্র অন্যায়-বন্যায় প্লাবিত তাঁর অন্তরাত্মা
ঘুষ-জর্জর পঞ্জর-পিঞ্জর ছাড়ে আর কি!
সর্বনাশ! পৃথ্বীশ মজুমদার সজনে-পাড়ার?
মেয়েছেলের কেউ অসম্মান করলে কাঁচা মাথা
নামিয়ে নেয় যে স্কন্ধ থেকে প্রকাশ্যে দিনের আলোতে।
কেউ ঘুষ নিয়ে কোনো অন্যায়কে সমর্থন করেছে
শুনলে, হুস করে কোথা থেকে এসে পড়ে সে সদলে।
তারপর চক্ষের পলক ফেলবার আগেই
ঘুষ-গ্রাহকের নাক-কান কেটে নিয়ে
তাকে স্মারকচিহ্ন বিশেষ যে দেয় বানিয়ে
অকম্পিত হাতে,
এই সেই অসৎ পুলিসের
ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের প্রলয়ঙ্কর নায়ক
পৃথ্বীশ মজুমদার!
অধীরবাবু সত্যি সত্যিই এখনও ইহলোকেই
বিরাজ করছেন কিনা—
সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারছিলেন না
নিজে কিছুতেই।

আমি—

তোমরা যে-কাজ ঘেন্নার চোখে ছাখো—
সেই কাজই প্রতি পদে পদে আমি করেছি,
'প্রবঞ্চক' সে আমারই পোশাকী নাম।
তোমরা যে-পথ থেকে ভয়ে দূরে থাকো—
সেই পথই আমি দ্বিধাহীন প্রাণে ধরেছি,
অন্য জাতীয়া কন্যা আমার বাম।

তোমরা মিথ্যে শুনলেই ছি-ছি করো
সেই মিথ্যেই আমার নিত্য সাথী,
সত্যি বলতে ভুলেছে আমার জিভ্।
স্বার্থসন্ধ কামেতে অন্ধ বড়—
লোভের তৃষায় মনে হয় ফাটে ছাতি,
আমি অমানুষ, আমি হীন, আমি ক্লীব।

কিন্তু সবার ওপরে যেখানে আমি
গড্ডালিকার প্রবাহ-বিরোধী মাছ,
একম্‌এবাদ্বিতীয়ম্‌ বিপ্লবী—
মানি নে আইন, করি নে সাল্‌তামামি,
পরি না মুখোশ, নাচি না ভণ্ড নাচ্,
সেখানে স্বয়ং পবিত্রা জাহ্নবী
আমার উদ্ধত শিরেতে রহেন বাঁধা;
পায়ের নীচেতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব
ভণ্ডামিভরা ব্রহ্মাণ্ডের পতি—
কণ্ঠ তাঁদের কান্নার সুরে সাধা
আমার পাবকে পুড়ে তারা নির্জীব।
আমিই সেখানে আমার বিশ্ব-পতি।